তান্ত্রিকদের বিচিত্র কাহিনী

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

শিশির পাবলিশিং হাউস
২২।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬
১৩৫৪

শ্রীতপনকুমার মিত্র, কর্তৃক কলিকাতা, ২২।১ বিধান সরণীস্থ।
শিশির পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত ও উক্ত স্থানে
অবস্থিত শিশির প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

তান্ত্রিকদের বিচিত্র কাহিনী

—— ০:৩০*৩০:০ ——

এক

শব-সাধনা

স্পিরিটের সঙ্গে ইহলোকের জীব আমরা....আমাদের সংযোগ-স্থাপনার যে কটি উপায়, তার মধ্যে টেবল-টার্ণিং, প্লাঞ্চেট, মিডিয়াম প্রভৃতির পরিচয় আমরা এ-পর্য্যন্ত কতক পেয়েছি! অনাহূতভাবে বিদেহী আত্মা এসে ইহলোকের জীবের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনা করেন.... তারো বহু সত্য কাহিনী আমরা পেয়েছি। কিন্তু টেব্‌ল্‌, প্লাঞ্চেট প্রভৃতি ছাড়া এদেশে আর একটি প্রণালীর কথা আমরা চিরকাল শুনে আসছি। সে হলো, তন্ত্রমতে শব-সাধনার কথা....অর্থাৎ মড়া চেলে স্পিরিটকে বশে আনার ব্যাপার। মহাকবি কালিদাস রচিত অমর গ্রন্থ 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি'....তাতে আমরা পড়ি রাজা বিক্রমাদিত্যের কাহিনী। তিনি তান্ত্রিকের সঙ্গে শ্মশানে গিয়ে সাধনার বলে তাল, বেতাল দুটি বিদেহীকে পেয়েছিলেন আজ্ঞাবহ অনুচরের মতো।

তাছাড়া তান্ত্রিক-বশীভূত আরো বহু বিদেহীর গল্প এদেশে প্রচলিত আছে অতি প্রাচীন যুগ থেকে। শ্মশানে বিশেষ প্রক্রিয়াদির জোরে তান্ত্রিকরা হন পিশাচসিদ্ধ, ভূতসিদ্ধ এবং তাঁরা নানা অলৌকিক ক্রিয়া-কর্ম্ম করে থাকেন। বাণমারা বলে একটি প্রক্রিয়ার কথা শুনি....আমি দুবার স্বচক্ষে 'বাণমারা' প্রত্যক্ষ করেছি এই সহর কলকাতায়। প্রথম বার প্রত্যক্ষ করি ১৯২৫ সালে। কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে এখন যে-জায়গায় 'চিত্রা' সিনেমা গৃহ, ও-জায়গা তখন খালি পড়েছিল....আমি থাকতুম ও-জায়গার ঠিক পাশে ৮২।৪ নম্বর বাড়ীতে। একটা ছুটীর দিনে দুপুর বেলায় চাকর-বাকরের মুখে শুনলুম, পাশের খোলা জমিতে এক যাদুকর বাণমারার খেলা দেখাচ্ছে। কৌতূহলবশে দোতলার ঘরের জানলা দিয়ে দেখেছিলুম, কি মন্ত্র পড়ে একজন দর্শককে উদ্দেশ করে সে বললে—তোমাকে বাণ মারছি! হাতের প্রক্ষেপমাত্র করলো সে....সঙ্গে সঙ্গে তার লক্ষ্যীভূত লোকটি মাটীতে লুটিয়ে পড়ে যাতনায় ছটফট করতে লাগলো—যেন ধনুষ্টঙ্কারের রোগী! তার পর সে উঠতে পারে না! তার যাতনা দেখে যাদুকরকে সকলের ভৎসনা....যাদুকর তখন কি প্রক্রিয়া করতে সে-লোক আরোগ্য লাভ করে গা ঝেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

দ্বিতীয় বার দেখেছিলুম ভবানীপুরে....চক্রবেড়িয়া অঞ্চলে। সেখানে এক যাদুকর (পথে পথে ঘুরে ম্যাজিকের নানা কেরামতি দেখিয়ে বেড়ায়) বললে—আমি বাণ মারা জানি। একজন জোয়ান যুবক তাকে বরাবর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করছিল....সে বললে—মারো তোমার বাণ আমাকে।

যাদুকর তখন কি-সব প্রক্রিয়া করে তাকে বাণ মেরেছিল—হাতের প্রক্ষেপমাত্র। গোড়ার দিকটা আমি দেখিনি। ভিড় দেখে প্রশ্ন করতে আমি শুনলুম, বাণ মেরেছে। তখন গিয়ে দেখি, মাটীতে পড়ে এক জোয়ান ছোকরা....তার হাত-পা দুমড়োনো....কিছুতে সিধা করতে পারছে না....আর যাতনায় সে কাতরাচ্ছে।

সকলের কথায় যাদুকর করলো তাকে বাণমুক্ত। যুবক উঠলো গা ঝেড়ে....উঠেই তার ঝাঁজ মেজাজ....বলে—তোমাকে পুলিশে দেবো।

যাদুকর বললে—আমার কি কশুর? আপনিই বললেন।

যাদুকরকে পুলিশে দেওয়া হয়নি। পাঁচজনে তখন যুবককে করলো ভৎর্সনা....যুবক লজ্জা পেয়ে পালালো। তার পর যাদুকর বলেছিল—আমাদের এমন তন্ত্রমন্ত্র জানা আছে....তার জোরে বাণ মেরে মানুষকে ঘায়েল করা যায়। হাত-পা দুমড়োনো সামান্য ব্যাপার....বাণ মারলে মুখ দিয়ে ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠে মানুষ মারা যায়! অবশ্য তা করলে যাদুকরের অমঙ্গল একদিন হবেই। তবু বাবু, বেশী টাকার লোভে অনেক ওস্তাদ জ্ঞাতি-বিদ্বেষের বিরোধে-বিবাদে একপক্ষের কাছ থেকে মোটা টাকা খেয়ে অপর পক্ষের মালিককে বাণ মেরে মেরে ফেলেছে।

যাদুকর যে-কথা বললে, সে-কথা মিথ্যা নয়। এমন একটি ঘটনার কথা আমরা শুনেছি। নৈহাটীতে এ-বিদ্যায় এমনি ওস্তাদ একজন লোক বাস করতো। একটা জ্ঞাতি-বিরোধের ব্যাপারে জমিজমা নিয়ে মামলা-মকর্দ্দমা....সে-ব্যাপারে এক পক্ষের কাছ থেকে কিছু মোটা

টাকা পেয়ে 'বাণ মারা' প্রক্রিয়ায় অপর পক্ষের কর্ত্তাকে এবং কর্ত্তার ছেলেকে সেই ওস্তাদ প্রাণে মেরেছিল। সামনাসামনি দাঁড়িয়ে এ বাণ মারার ব্যাপার চলে না। ওস্তাদ কোন্ দূর কোণে বসে প্রক্রিয়া করলো....যার বিরুদ্ধে বাণ মারা, সে আছে কত দূরে....এখান থেকে ওস্তাদের বাণে দূরের সে লক্ষীভূত ব্যক্তি মুখে রক্ত উঠে প্রাণে মারা যাবে!

শুনেছি, তন্ত্রমতে এ-বাণকে খণ্ডিত করা যায়!

এখন এই শব-সাধনার কিছু আলোচনা করা যাক ঃ

পিশাচসিদ্ধ বা বেতালসিদ্ধ মানুষ হয় বেশীর ভাগ স্বার্থের তাড়নায়। কেউ চায় বিপুল ক্ষমতা....কেউ চায় ইন্দ্রিয়-সম্ভোগ....কেউ চায় আক্রোশ বা প্রতিহিংসা মেটাতে। জগতের বা জগজ্জনের মঙ্গলের জন্যও অনেকে অবশ্য বশীভূত প্রেতাত্মাকে দিইয়ে তা সাধন করান।

আমরা চিরকাল শুনে আসছি, পিশাচসিদ্ধ হতে চাইলে অমাবস্যা রাত্রে....গভীর রাত্রে নির্জ্জন এবং ভয়ঙ্কর শ্মশানে গিয়ে কালীপূজা করতে হয়....শব এনে সেই শবকে আসন স্বরূপ করে অর্থাৎ শবাসনে বসে। এর জন্য চাই শবদেহ....কঙ্কাল নয়, মেদমাংসযুক্ত প্রাণহীন দেহ! কিন্তু আমরা হিন্দু....মানুষ মরে গেলে তার দেহ দাহ করি....কাজেই মৃতদেহ প্রায় দুর্লভ। তবে 'বেওয়ারিশ-মড়া' মেলে! তাছাড়া বহু জাতির মধ্যে প্রথা ছিল, সর্প-দংশনে কেউ মারা গেলে তার দেহ দাহ করা হতো না....জলে ফেলা হতো। কারণ জলে থেকে বহু সর্পদষ্ট ব্যক্তি পরে প্রাণ পেয়ে সজীব হতো। এ-সম্বন্ধে ইতিহাসে দেখি—

Men who were to all appearance dead from snake-bites are sometimes found to revive.

কিন্তু যে-ব্যক্তি পিশাচসিদ্ধ হতে চায়....কবে কোথায় কোন্ মানুষ সাপের কামড়ে মৃতবৎ হবে এবং তার দেহ জলে নিক্ষিপ্ত হবে, তার প্রত্যাশায় বসে থাকলে তো চলবে না!

যাই হোক, এ-সাধনার জন্য মৃতদেহ বা শব চাই।

শব পাওয়া গেলে তার পর যে-প্রক্রিয়া প্রচলিত আছে, তার কথা বলি :—

সাধক যদি শব সংগ্রহ করতে পারেন, তাহলে অমাবস্যার রাত্রে সেই শব নিয়ে তিনি যান নির্জ্জন ভয়ঙ্কর শ্মশানে....শ্মশানে নিয়ে গিয়ে শবকে শোয়াতে হবে চিৎ করে উত্তর-দক্ষিণে লম্বিত করে....তার পর কালীপূজা—প্রতিমার প্রয়োজন নেই....পূজার আয়োজন আগে থেকে করে রাখা হয়। শ্মশানে একজন অনুচর আনবার ব্যবস্থা...একজন ছাড়া দুজন নয়! একজন অনুচর আনার হেতু, সাধনার সময় যদি বিভীষিকা দেখে (বিভীষিকা নাকি দেখতেই হয়), মূর্চ্ছা হতে পারে.... অনুচর তাহলে সে-সময় সেবা-শুশ্রূষা করে সচেতন করে তুলবে। শোনা যায়, সাধনাকালে ভূতপ্রেতের দল কখনো সাপ, বাঘ, বরা প্রভৃতি রূপ পরিগ্রহ করে...কখনো কন্ধকাটা, প্রেত্নিনী, শাঁখিনী প্রভৃতির মূর্ত্তি ধরে ভয়ানক ভয় দেখায়....কখনো বা মায়ের রূপ ধরে মিনতি জানায়, ঘরে যাও বাবা! কখনো পত্নীর রূপ ধরে....কখনো পুত্রকন্যার রূপ ধরে মিনতি জানায়, মমতার আহ্বানে নিবৃত্ত করবার প্রয়াস পায়....কখনো বা রূপসী কিশোরীর বেশে উদয় হয়ে নানা

প্রলোভন দেখায়। এ-সব কাটিয়ে উঠতে পারলেই তবে এ-সাধনায় সিদ্ধিলাভ ঘটে।

কখনো ভূত-প্রেত বা অদৃশ্য নানা মূর্তি বলে, বড় খিদে....খেতে দাও....পানীয় দাও—তখন সাধককে কিছু কিছু ভোজ্য দিতে হয় বাতাসে ছুড়ে। এজন্য সাধনা-কালে ভোজ্য-পানীয় কিছু সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়। তার পর সিদ্ধিলাভ অর্থাৎ ঐ শবের দেহে হয় ভূত-প্রেতের ভর....তখন তাকে যে-হুকুম দেবে, একান্ত বশীভূতের মতো সে তা পালন করবে।

এই হলো শব-সাধনার মোদ্দা কথা। সাধনায় মন্ত্রাদি আছে, পূজার পাঠ আছে....সে-সব শাস্ত্রে নিহিত! আমাদের হিন্দুর যেমন শব-সাধনার ব্যবস্থা, অন্য জাতিরও তেমনি অনুরূপ ব্যবস্থা আছে...শুধু পদ্ধতিতে যা পার্থক্য।

একটি কাহিনী বলি ঃ—

একজন সুধী ইংরেজ মুস্লিম কালচার সম্বন্ধে অনুশীলন করছিলেন। অনুশীলনের সুবিধার জন্য পারস্যের নানা স্থানে প্রাচীন এবং নবীন বহু পণ্ডিতের সঙ্গে তিনি দেখা করেন এবং এ-সব সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেন। ইংরেজটির নাম হিলাম।

পারস্যে তিনি কথায় কথায় গল্প শোনেন—সে-দেশে স্পিরিচুয়ালিজমের অনুশীলন চলে এবং এমন অনেক 'ওস্তাদ' আছেন, যাঁরা স্পিরিটদের উপর যথেচ্ছ প্রভাব-প্রতিপত্তি চালনা করতে পারেন। তখন তাঁর এ-বিষয়ে সন্ধান নেবার কৌতূহল হয় এবং সে-কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য তিনি সন্ধান পান, দামাস্কাস থেকে কিছু দূরে ছোট একটি

সহর আছে....সহরের নাম কুতিয়েফ—সেখানে আছেন সেখ হাশান নামে এক গুণী ওস্তাদ....এ-বিদ্যায় সেই সেখ হাশানের অসাধারণ পারদর্শিতা।

হিলাম তখন সেখের সঙ্গে দেখা করেন এবং অনুরাগী ছাত্রের নিষ্ঠা নিয়ে তিনি সেখ হাশানের দ্বারস্থ হন। তাঁর আন্তরিকতা দেখে সেখ হাশান হিলামকে স্নেহভরে গ্রহণ করেন এবং আশ্বাস দিয়ে বলেন, হিলামকে তিনি স্পিরিচুয়ালিজ্‌মের অলৌকিকত্ব প্রত্যক্ষ করাবেন। তিনি বলেন, দামাস্কাস থেকে বহু দূরে উত্তর-পূর্ব্ব দিকে অতি প্রাচীন যুগের এক সমৃদ্ধ রাজার প্রাসাদের ভগ্নস্তূপ আছে। ওদিকে মানুষ-জনের বসতি নেই....ছোট পাহাড় আছে....পাহাড়ের কোলে আছে প্রকাণ্ড কূয়া এবং এককালে যেখানে ছিল সমৃদ্ধ রাজধানী, এখন সেখানে শুধু ধূ-ধূ প্রান্তর....জনহীন—ওদিকে মানুষজনও চলে না। ও-প্রান্তরের সীমানা মানুষ এড়িয়ে চলে....কারণ সকলের বিশ্বাস, ও-জায়গাটা বহু ক্ষুব্ধ আত্মার বিচরণভূমি।

হিলামকে সেখ হাশান বলেন, সেখানে তিনি গিয়ে সাধনায় বসবেন এবং হিলামকে নিয়ে যাবেন সঙ্গে....হিলামকে দেখাবেন অলৌকিক অনৈসর্গিক নানা ব্যাপার।

সেখ হাশান সেইরকম ব্যবস্থা করলেন....হিলামকে বললেন—মঙ্গলবার এবং বৃহস্পতিবার এ দুটি দিনে সন্ধ্যার চার ঘণ্টা পরে হলো সাধনার জন্য প্রশস্ত সময়। এখান থেকে মঙ্গলবার আমরা দুজনে যাত্রা করবো সূর্য্যাস্তের দু-তিন ঘণ্টা পূর্ব্বে....তাহলে যথাসময়ে সেখানে পৌঁছে সাধন-ভজনে বসতে কোনো অসুবিধা ঘটবে না। তুমি বয়ে

নিয়ে যাবে পুঁটলিতে করে ধূপ-ধূনা গুগগুল। আমি সাধনায় বসবার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে আগুনে ধূপ-ধূনা দিয়ে যেতে হবে....বিরাম-বিচ্ছেদহীনভাবে....যতক্ষণ না সিদ্ধিলাভ হয়। নিমেষক্ষণ ধূপধূনার বিচ্ছেদ না ঘটে। গন্ধবারিও ছিটুনো চলে পিচকারী করে। তার প্রয়োজন নেই....ধূপ-ধূনা হলেই কাজ হবে। তোমার সঙ্গে থাকবে তার জন্য প্রচুর কাঠকয়লা....সেই কয়লায় আগুন জ্বালানো হবে। আর একটা কথা....হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি, স্পিরিটের আবির্ভাব হলে তাকে দাসদাসীর মতো তুচ্ছ-তাচ্ছল্য করা নয়....তাদের শ্রদ্ধা করবে, সম্মান করবে। আর যা উপকরণ....সেখ হাশান বললেন—তিনি নিয়ে যাবেন।

তার পর এ-সম্বন্ধে তিলাম যা লিখেছেন তাঁর গ্রন্থে, তার মর্ম্ম :—

মঙ্গলবার বৈকালে আমরা বেরুলুম সেই ভগ্নস্তূপের উদ্দেশে। নির্মেঘ পরিষ্কার দিন....পড়ন্ত রৌদ্রে তাপ নেই....বেশ স্নিগ্ধতা। সহর ছাড়িয়ে একটু এগুতেই দিগন্ত-প্রসারী মুক্ত প্রান্তর।

ক্রমে আমরা বিজন প্রান্তরে এলুম....দূরে দেখা গেল, অস্ত-সূর্য্যের কিরণ-মাখা প্রাচীন সমৃদ্ধির ধ্বংসস্তূপ—কি বিরাট সে-রূপ! দেখে মুগ্ধ বিস্ময়ে ভাবলুম, একালের চেয়ে কত গরিমাময় সেকালের সমৃদ্ধি!

রাত্রি নামলো। নীচেকার সমতলভূমি থেকে পাহাড় প্রায় দুশো ফুট উঁচু....এর বুকে স্তূপ—ভাঙ্গা থাম, থিলান, আর বড় বড় পাথরের দেয়াল....মাথায় আবরণ নেই। কোনো পাখীর বা পতঙ্গেরও

সাড়াশব্দ নেই। দূরে কোনো গ্রামে শেয়াল ডাকছে....প্যাঁচার ডাকও শোনা যায়। এ-জায়গা শুষ্ক....গাছপালা নেই, তৃণগুল্মের চিহ্নও নেই।

পাহাড়ের কোলে আমরা বসলুম....কূয়াতলা বেশী দূরে নয়—বিশ্রাম হলো...তার পর খাওয়া। সেখ এনেছিলেন সঙ্গে কখানা চাপাটি এবং একরাশ অলিভ। সঙ্গে আনা হয়েছিল লম্বা দড়ি-বাঁধা ঘটি....কূয়ায় ঘটি নামিয়ে কূয়া থেকে জল তুলে হাত-মুখ ধোওয়া হলো....কূয়ার জল পান করা হলো। মাথার উপর একটু ফালি চাঁদ ছিল....খানিক পরে সে-চাঁদটুকুও সরে গেল—চারিদিক ভরে মিষ কালো অন্ধকার! সূর্য্যাস্তের পর চার ঘণ্টা কাটলো।

সেখ হাশান বললেন, এবারে তিনি সাধন-ভজনে বসবেন। আমাকে বলে দিলেন, কাঠকয়লার আগুন জ্বালা হয়েছে....ও-আগুনে সমানে ধূনা দিতে হবে....যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সাধন শেষ হয়....এক সেকণ্ড বিরাম নয়, বিচ্ছেদ নয়! বারবার অভয় দিলেন, আশ্বাস দিলেন....বললেন—যা দেখবে, বা শুনবে....ভয় পেয়ো না।

তিনি বসলেন দক্ষিণ দিকে মুখ করে....আমি বসলুম তাঁর কাছেই পূবদিকে মুখ করে (at right angles)—স্তূপের দিকে পিছন করে বসলুম। কয়লার আগুনের আভায় সেখের মুখে দেখলুম, কেমন দৃঢ়তার ভাব।

সেখ হাশান আমাকে জানিয়েছিলেন, তিনি বিশেষ সঙ্কেত দিলে আমি আগুনে ধূনা দেওয়া সুরু করবো। সেই কথা মেনে আমি দিলুম আগুনে ধূনা। তিনি আসনে বসে উচ্চ কণ্ঠে মন্ত্রাদি পড়ে উপাসনা

করলেন....তার পর উঠে দাঁড়ালেন। তার পর দক্ষিণ দিকে ক'পা এগিয়ে এলেন....তার পর থমকে দাঁড়ালেন....দাঁড়িয়ে মৃদুকণ্ঠে কি-সব মন্ত্র উচ্চারণ করলেন। আমি কাণে শুনলুম....কিন্তু তার অর্থ বুঝলুম না। তার পর আবার ফিরে এসে আসনে বসলেন·· মৃদুকণ্ঠে মন্ত্র পড়তে পড়তে এসে বসলেন। তার কিছুক্ষণ পরে আবার উঠে দাঁড়ালেন....দাঁড়িয়ে এবার পূর্বদিকে ক' পা এগুলেন মন্ত্র পড়তে পড়তে.... তার পর ফিরে এসে আসনে বসা এবং কিছুক্ষণ পরে-পরে পর্য্যায়ক্রমে দাঁড়িয়ে একবার উত্তর মুখে, আর একবার পশ্চিম মুখে ক' পা এগুলেন। তার পর আবার আসনে বসে মন্ত্রপাঠ। (শুনেছি, চারদিকে এগুনো ....এর অর্থ, চারিদিকে বন্ধন দেওয়া।)

প্রথমটা আমার গা ছমছম করছিল ভয়ে....কিন্তু কিছু ঘটলো না যখন, তখন ভয় ভেঙ্গে মনে ভরসা জাগলো। এমনিভাবে ওঁর মন্ত্র-পড়া, ওঠা-বসা চললো প্রায় ঘণ্টাখানেক....তার পর দেখি, বিদ্যুৎ-চমকের মতো আলোর সূক্ষ্ম রেখা! রেখা বেশ দীর্ঘ....উপর থেকে নীচে পর্য্যন্ত—দৈর্ঘ্যে প্রায় ত্রিশ ফুট। সে-আলো ভেদ করে কোনো কিছু দেখলুম না—আমার কাছ থেকে পঞ্চাশ ফুট দূরে আলোর রশ্মি.... তার পরেই কিন্তু মিষ কালো অন্ধকার।

সেখ হাশান সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন....ডান হাত ঐ রশ্মির দিকে প্রসারিত। ও-রশ্মি এলো কাঁপতে কাঁপতে পঞ্চাশ ফুট দূর থেকে আমাদের দিকে এগিয়ে···কাছে....পাঁচ-সাত গজ মাত্র দূরে। আমাদের পিছনে ঘন-ঘোর অন্ধকার। সেখ হাঁকলেন—এখন এসো (Appear now)। এ-কথা তিনি উচ্চারণ করলেন....একবার, দুবার, বার-বার।

ক' মিনিট পরে আমি শুনলুম মেঘের ডাকের মতো গুড়গুড় আওয়াজ....মৃদু হ'লেও স্পষ্ট আওয়াজ। তার পর আমি অনুভব করলুম, আমার মাথায় কে যেন হাতের টোকা মারলো....তার পর আমার দু হাঁটুতে টোকা! চমকে চেয়ে দেখি, এক পীস হাড়! এ-হাড় দেখার সঙ্গে সঙ্গে মাথায় আবার টোকা এবং এ-টোকা বেড়ে চললো। টোকা চলার সঙ্গে সঙ্গে বড় এক পীস হাড় পড়লো....ভারী জিনিষ মাটীতে পড়লে যেমন শব্দ হয়, তেমনি শব্দ শুনলুম স্পষ্ট। তার পর আমার সামনে পিছনে আশে পাশে অসংখ্য হাড় পড়তে লাগলো। তার পর পড়লো কটা মড়ার মাথা! তার পর পড়লো রক্তমাখা একটা মাথা.... মুখে কাটা দাগ—মাথাটা পড়লো আমার গায়ে। তপ্ত রক্তের স্পর্শ পেলুম আমার বাঁ হাতে—আমার বাঁ দিকেই মাথাটা পড়লো...পড়ে বাতাসে মিলিয়ে গেল। কয়লার আগুনের আলোয় এ-সব স্পষ্ট দেখছি! মাথা অদৃশ্য হবার সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘাড় দারুণ হিমেল স্পর্শে ঝনঝনিয়ে উঠলো। দেখি, একটা বড় সাপ আমার গলা জড়িয়ে ধরছে....এমন জোরে জড়ানো যে নিশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম। তার পর গ্রন্থি মোচন করে বড় ফণা নামলো আমার মুখের সামনে—গলার বাঁধন শিথিল....ফণা তুলে লকলকে জিভ দেখালো.... হিসহিস শব্দ। ভয়ে আমি স্তম্ভিত....তবু সেখের আশ্বাসে ভর করে আমি সমানে আগুনে দিচ্ছি ধূনোর গুঁড়ো! তার পর দেখি, সাপ আর সাপ....হাজার হাজার সাপ জড়ো হচ্ছে—দুনিয়ার যত সাপ যেন এসে জুটেছে! তার পর একটা লম্বা মোটা সাপ আমার কাঁধে উঠলো। প্রকাণ্ড তার মাথা....ছোট বানরের মাথার মতো—

সাপের মাথায় একরাশ চুল। সাপটা মাথা দোলাতে দোলাতে আমার গালে স্পর্শ দিতে লাগলো! আমি কি করে সচেতন ছিলুম, জানি না—ভয়ে কাঠ....তবু সমানে আগুনে দিচ্ছি ধূনোর গুঁড়ো! তার পর আমার দৃষ্টি পড়লো সামনের দিকে....দেখি, একটা প্রকাণ্ড জানোয়ার আসছে—প্রকাণ্ড হায়েনার মতো দেখতে! সেটা এলো আমাদের সামনে....হুঙ্কার তুলে তার মুখটা আনলো আমার খুব কাছে.... তার নিশ্বাস লাগলো আমার মুখে। তার পর চোখের পলক পড়লো না....সাপ, হায়েনা সব বাতাসে মিলিয়ে গেল।

এগুলো মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত কিম্ভুত চেহারার কত জীবের আবির্ভাব ঘটতে লাগলো—জীবগুলোর আকার অদ্ভুত হলেও মুখগুলো মানুষের মতো....প্রত্যেকের মুখে বেদনা এবং আক্রোশের ভাব। তারা এসে মাথা নীচু করে কুঁকড়ি মেরে চলে যেতে লাগলো সেথ শ্মশানের পাশ দিয়ে....তার পর আমার কাছ দিয়ে যেতে লাগলো। আমার তখন চেতনা যেন উবে গিয়েছে। আমাকে কে যেন মাটীতে পুঁতে রেখেছে—নড়ার চড়ার সামর্থ্য নেই! চেতনা কিন্তু ঠিক আছে....সব দেখছি, শুনছি এবং আগুনে ধূনোর গুঁড়ো সমানে দিয়ে চলেছি।

তার পর সুরু হলো চারিদিকে বিচিত্র রকমের শব্দ! পিছন দিক থেকেই বেশী শব্দ—কখনো শুনি অট্টহাসির রোল....কখনো শুধু আর্ত্ত ক্রন্দন। আমার রক্ত যেন হিম হয়ে আসছিল....পিছন দিকে ফিরে চাইবো, সাহস হলো না।

এ-সব কিম্ভুত আকার বাতাসে মিলিয়ে গেল। তার পর ঝমঝম

শব্দ—যেন শিকল-আঁটা অসংখ্য বন্দী আসছে! দুটি মূর্ত্তি দেখলুম···নতজানু হয়ে তারা আমাদের সামনে দিয়ে চলে গেল। তার পর আরো···আরো···আরো বন্দী···আমাদের সামনে এসে মাটী থেকে ধূলো কুড়িয়ে নিজের নিজের মাথায় নিয়ে তারা বাতাসে মিলিয়ে যেতে লাগলো। দেখে আমি তখনো কাঠ···সচেতন মন কিন্তু···ধূনোর গুঁড়ো দিচ্ছি আগুনে।

তার পর দেখি, দুটো জোয়ান পুরুষ···সুদৃঢ় কঠিন গড়ন···মুখে-চোখে রোষ এবং বিদ্বেষ যেন মাখানো···গায়ের বর্ণ কালো—তাদের একজন বসলো সেখ হাশানের পায়ের কাছে···আর একজন বসলো আমার সামনে। আমার সর্ব্বাঙ্গে হিমেল শিহরণ! আমার সামনে যে বসলো, তার দৃষ্টি আমার মুখে নিবদ্ধ—তার পর দাঁত বার করে তার হাসি···ক্রূর বিদ্রূপের হাসি। আমি সিঁটিয়ে আছি।

সেখ হাশানের সামনে যে বসলো, সে শুধু ওঠ-বোস করছে···সেখ হাসান তার দিকে চেয়ে নিম্নকণ্ঠে মন্ত্র উচ্চারণ করছেন। শেষে দুজনে উঠে দাঁড়ালো···তার পর মাথা নীচু করে ধীরে ধীরে পিছু হঠে চলে গেল। তার পর ঘনঘোর অন্ধকার।

একটু আলোর রেখা ফুটলো সে ঘন অন্ধকারে···সে-আলোর আভায় সেখ হাশানের দিকে চেয়ে আমি দেখি, তাঁর মুখে একাগ্র সুদৃঢ় ভাব। তাঁর সামনে···তাঁর কাছ থেকে ক' গজ দূরে হঠাৎ মাটী গেল ফেটে এবং সে-ফাটল থেকে বিনির্গত হলো তিনটি মনুষ্যমূর্ত্তি! কিন্তু মূর্ত্তিগুলোর মুখ মড়ার মতো সাদা—তাদের পরণে ছেঁড়া থলির হাফ প্যাণ্ট, গায়ে কালো সার্ট···দেহের অবশিষ্ট অংশ আবরণহীন!

তারা দাঁড়ালো সেখ হাশানের সামনে....তাদের দিকে সেখ হাশান বারবার ডান হাত প্রসারিত করতে লাগলেন। তারা বসলো মাটীতে ....যেন সেখ হাশানের আদেশে বসলো! মূর্ত্তিদের ভাবে-ভঙ্গীতে অজস্র মিনতি....কিন্তু সেখ হাশানের দৃঢ় কঠিন দৃষ্টি—তিনি সমানে হাত প্রসারিত করছেন....মৃদু কণ্ঠে কি তাদের বলছিলেনও। আমি তাঁর স্বর শুনলেও যা বলছিলেন, তার অর্থ বুঝছিলুম না। শুধু দুটো নাম শুনছিলুম—'মারিখ' আর 'সান হুরেশ'...এই দুটি নাম। আর সেই সঙ্গে আদেশ—আলবৎ আসবে। এই 'আলবৎ আসবে' যখনি তিনি বলছিলেন, তখনি তারা মাথা নামাচ্ছিল।

তার পর তারা সেই মাটীর ফাটলে ঢুকে অদৃশ্য হলো।

তার পর চমকে উঠলুম হঠাৎ এক মর্ম্মভেদী আর্ত্তরবে—যেন কোনো বিপন্না নারী ভয়ে বেদনায় চীৎকার করলো! এমন তীব্র, তীক্ষ্ণ এবং উচ্চ সে-আর্ত্তরোল যে মনে হলো, বাতাস বুঝি স্তব্ধ হয়ে গেছে! চারিদিকে আমি চেয়ে দেখলুম....কিন্তু কিছু দেখলুম না। তার পর আবার সেই চীৎকার....এবার আরো তীব্র, কণ্ঠ আরো উচ্চ! তার পর আলোর একটু ঝলক....দেখি, দুটো জোয়ান পুরুষ টেনে নিয়ে আসছে এক নারীকে। নারীর মুখ প্রথমে দেখতে পাইনি....সে ছিল নতমুখে—কিন্তু তারা কাছে এলো। নারী বসলো আমার ঠিক সামনে....বসে মাথা তুলে আমার পানে চেয়ে দেখলো!

যা দেখলুম....শিউরে উঠলুম! দেখি, আমার মৃতা জননী! কিন্তু তাঁর মুখে-চোখে কি ভয়াতুর ভাব—যেন বড় ব্যথা পেয়েছেন, বড় ভয় পেয়েছেন....আমার কাছে মিনতি জানাচ্ছেন—রক্ষা করো!

মা....আমার মা! আমার বুক দুললো....দু-চোখে জল এলো.. হৃৎপিণ্ডটা যা করতে লাগলো, বুঝি এখনি ছিটকে বেড়িয়ে পড়বে! আমার মায়ের চোখে জল! মায়ের মুখ আমার কাছে এলো—অমনি সেই যমদূতদের মধ্যে একজন মায়ের মাথার চুল ধরে টানলো.... তার পর মাথার চুল ধরে তাঁকে হ্যাঁচকা-হেঁচকি-টান দিয়ে মাটীর উপর দিলে আছড়ে ফেলে। মা তখনি উঠলেন ..বসলেন....বসে সে-লোকটার জানুতে হাত দিয়ে করুণা-প্রার্থনার ভঙ্গী করলেন।

লোকটা জোরে ধাক্কা দিয়ে তাঁকে দূরে ছিটকে ফেলে দিলে...তার সঙ্গী ঘুষি পাকালো মাকে মারবে বলে। আমি থাকতে পারলুম না.... ধুনো ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালুম....বললুম—দাও দিকিনি তুমি আমার মায়ের গায়ে হাত!

এ-কথা বলে সে-লোকটার হাত ধরবো বলে হাত বাড়িয়েছি.... অমনি কোথায় গেল সে-সব মূর্ত্তি, কোথায় সে-আলো—সব অদৃশ্য! কয়লার আগুনের আভায় শুধু দেখি, সেখানে শুধু সেখ হাশান এবং আমি....আমরা দুজন ছাড়া আর কেউ নেই!

কি যে হলো চকিতে, প্রথমে আমার উপলব্ধি ছিল না—তার পর বুঝলুম! লজ্জা হলো, ভয় হলো—তাই তো, ভয় পেয়ে সেখ হাশানের সাধনা করলুম পণ্ড!

সেখ হাশান দেখি, প্রার্থনা নিবেদন করছেন উচ্চ কণ্ঠে। তার পর তিনি আমার দিকে চেয়ে বললেন—বড় কঠিন পরীক্ষা....এ-পরীক্ষায় ঠিক থাকা সম্ভব হতে পারে না। প্রথম তো....তা যাক! পরে আবার দুজনে বসবো....পরের বারে এমন হবে না। আজ আপনি

যেভাবে গোড়ার দিকটা নিজেকে ঠিক রেখেছিলেন, তা আমার আশাতীত।

সেদিন দু'ঘণ্টা এ-সাধনা চলেছিল....কিন্তু ঐ দু ঘণ্টা আমার মনে হয়েছিল, বিশ ঘণ্টা! আরো দেড় ঘণ্টা ওখানে থেকে আমাদের জিনিষপত্র গুছিয়ে-গাছিয়ে নিয়ে আমরা সহরে ফিরলুম।

হিলাম লিখছেন—তার পর কদিন ছিলুম ও-সহরে সেখ হাশানের গৃহে তাঁর অতিথি হয়ে!

যা প্রত্যক্ষ করেছিলুম....আমার দোষে সাধনার বিঘ্ন ঘটে পণ্ড করা ....তবু যা দেখেছিলুম, তা অলৌকিক! ভাবছি, সাধনার বলে মানুষ কি অসাধ্য না সাধন করতে পারে!

দুই

তন্ত্রের শক্তি

তন্ত্রশাস্ত্র এবং তান্ত্রিক সম্বন্ধে অনেকেই মনে অত্যন্ত ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে একটু আলোচনা করেছি····পরে আরো খানিকটা আলোচনা করবো—যে আলোচনায় এ সম্বন্ধে মোটামুটি সত্য ধারণা জন্মায়।

পণ্ডিত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয় এ সম্বন্ধে সুগভীর নিষ্ঠাভরে বহু তথ্য এবং তত্ত্ব লাভ করেছিলেন।

এখন বলি, তাঁর প্রত্যক্ষ-করা তান্ত্রিক শক্তির অলৌকিক বিবরণ।

মহাভারতী মহাশয় লিখেচেন—পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। স্যর দিনকর রাও, গোয়ালিয়র রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী····তন্ত্রশাস্ত্রে ছিল তাঁর সুগভীর জ্ঞান। তন্ত্রের 'স্বরোদয়' অংশ সম্বন্ধে তিনি চমৎকার একখানি গ্রন্থ লিখে গিয়েছেন। তিনি তন্ত্রোক্ত দৃষ্টিযোগ এবং আলোকযোগ সম্বন্ধে সাধনা করে কিয়দংশে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। রাধা স্বামী সম্প্রদায়ের প্রধান শিষ্য শালিগ্রাম লালা সাহেবের সঙ্গে ছিল তাঁর অন্তরঙ্গতা। লালা সাহেব ছিলেন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের পোষ্টমাষ্টার জেনারেল। সেকালে রাজনীতিকদের মধ্যে স্যর দিনকর ছিল সর্ব্বাগ্রগণ্যদের অন্যতম। লালা বিহারীলাল নামে এক ভদ্রলোক তখন ছিলেন বান্দা জেলার মাউ রাণীপুরের সাবডিভিশনাল অফিসার। বিহারীলাল ছিলেন খুব ধর্ম্মনিষ্ঠ।

মহাভারতী মহাশয় লিখেছেন—আমি তখন বিহারীলালকে বিনা বেতনে ইংরেজী শেখাতুম। তিনি হিন্দুস্থানী....তাঁর মাতৃভাষা ছিল উর্দ্দু....অফিসের কাজকর্ম্ম তিনি উর্দ্দু ভাষাতেই সম্পাদন করতেন। হঠাৎ সরকারী সাকু লার জারি হলো—সমস্ত তহশীলদার এবং ডেপুটি কলেক্টরদের ইংরাজী ভাষায় ডিপার্টমেণ্টাল পরীক্ষা দিয়ে পাশ করতে হবে....নচেৎ প্রমোশন বন্ধ। তখন বিহারীলালের অনুরোধে আমি তাঁকে ইংরেজী ভাষা শেখাতে লাগলুম।

সেখানে বিহারীলালের বাড়ীতে অতিথি আমি। বিহারীলালের কাছে স্যর দিনকর এবং শালিগ্রাম লালা সাহেব এসে তাঁর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন দুদিনের জন্য। তাঁরা যাবেন রাজপুরে তীর্থ করতে....তাই পথে লালা বিহারীলালের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ।

রাজপুর হলো হিন্দী রামায়ণের কবি তুলসী দাসের জন্মভূমি। আমরা মধ্যাহ্ন ভোজন শেস করেছি, এমন সময় এক দাক্ষিণী সাধু এসে উপস্থিত। তাঁর নাম গুণাধিপতি স্বামী। তিনিও এসে লালা বিহারীলালের গৃহে আতিথ্য নিলেন। আমরা সকলেই মহা সম্মানে মহা সমাদরে গ্রহণ করলুম। সাধুজীর বেশ নদীয়া জেলার বৈষ্ণব রমণীর মতো। তিনি কিছুকাল পশ্চিমঘাট গিরিশ্রেণীতে এক গুহার মধ্যে অতিবাহিত করেছিলেন। এ-গিরিশ্রেণীতে বহু সাধু-সন্ন্যাসীর বাস ...এখানে কমলা লেবুর ফলন যা হয়, তা প্রায় অসাধারণ বললে চলে। আমরা রাজপুরে তীর্থ করতে যাচ্ছি শুনে তিনিও চললেন আমাদের সঙ্গে। আমরা তীর্থে চললুম ক'জনে....অর্থাৎ লালা

শালিগ্রাম, স্যর দিনকর, লালা বিহারীলাল, সাধুজী, আমি....সঙ্গে তিনজন ভৃত্য....একটি পিয়ন এবং আমাদের কজন পাল্কী-বেহারা।

আমরা বিহারীলালের বাঙলো থেকে বেরুবো....এমন সময় এক পিয়ন এসে হাজির। কি ব্যাপার! সে এসেছে বার গড় রেল-ষ্টেশন থেকে....স্যর দিনকরের নামে গবর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ফরেন ডিপার্ট-মেণ্টের সেক্রেটারির টেলিগ্রাম নিয়ে....স্যর দিনকরের নামে জরুরি টেলিগ্রাম। তারের নির্দ্দেশ....সেক্রেটারি লিখচেন—স্যর দিনকরকে এখনি যেতে হবে এলাহাবাদ রেলষ্টেশনে। কেন? না, গবর্ণর জেনারেলের মধ্য ভারতের এজেণ্ট লেপেল গ্রিফিন চলেছেন ট্রেনে.... এলাহাবাদ ষ্টেশনে স্যর দিনকরকে দেখা করতে হবে গ্রিফিন সাহেবের সঙ্গে....অত্যন্ত জরুরি পোলিটিকাল মিশনে। স্যর লেপেল চলেছিলেন এলাহাবাদ হয়ে কলকাতায়....এলাহাবাদ ষ্টেশনে ট্রেনের কামরায় দেখা করতে হবে।

টেলিগ্রাম পেয়ে স্যর দিনকর বললেন, তিনি এখনি তাহলে বার গড় ষ্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরবেন....এলাহাবাদে যাবার জন্য। মৃদু হেসে সাধুজী বললেন—আপনাকে যেতে হবে না। পথে ট্রেনে স্যর লেপেল সাংঘাতিক ভাবে পীড়িত হওয়ার দরুণ তাঁকে তাঁর ট্রেনের কামরা থেকে নামিয়ে নিয়ে চিকিৎসাধীনে রাখা হয়েছে। দশদিনের বেশী তাঁকে এখন শয্যাগত থাকতে হবে....কাজেই আপনার এলাহাবাদে ছোটা পণ্ডশ্রম হবে। তার চেয়ে বলি, নিঃসংশয়ে চলুন আমাদের সঙ্গে রাজপুর তীর্থে।

তাঁর এ-কথা সম্পূর্ণ শিরোধার্য্য করে স্তর দিনকর চললেন আমাদের সঙ্গে রাজপুরে।

রাজপুরে পৌঁছবার পর তখন দু ঘণ্টা উত্তীর্ণ হয়নি....সাধু বললেন স্তর দিনকরকে—আপনার কোনো আপনজন কি বোম্বাইয়ে আছেন ?

স্তর দিনকর বললেন—আছেন। আমার ভাই শোভাকর !

সাধুজী বললেন—আজ সকালে তাঁকে কেউটে সাপে কামড়েছে.... তাঁর জীবনের কোনো আশা নেই...তাঁর মৃত্যু আসন্ন।

রাত সাড়ে নটার সময় মাউ রাণীপুর থেকে লোক এলো....তার হাতে টেলিগ্রাম....দিনকর রাওয়ের নামে টেলিগ্রাম....সেখানে পাবামাত্র এ-লোক মারফৎ টেলিগ্রাম তাঁরা পাঠিয়েছেন রাজপুরে। টেলিগ্রামে লেখা—শোভাকরকে সাপে কামড়েছে....সাংঘাতিক চোট....প্রাণের কোনো আশা নেই।

রাত এগারোটার সময় সাধুজী বললেন—শোভাকরের মৃত্যু হলো।

পরের দিন সকালে খবর এলো—সাধুজীর কথা বর্ণে বর্ণে সত্য.... শোভাকর বোম্বাইয়ে মারা গিয়েছে রাত ঠিক এগারোটায়।

এ-ব্যাপারের পর সাধুজীর উপর আমাদের ভক্তিশ্রদ্ধা বাড়লো চতুর্গুণ।

রাজপুর থেকে ফিরে আসবার পর একদিন সন্ধ্যাবেলায় বিহারীলাল বললেন সাধুজীকে—পরের দিন এলাহাবাদ হাইকোর্টে তাঁর একটা আপীল-মকর্দ্দমার শুনানি আছে। বিহারীলাল আপীল করেছেন.... অপর পক্ষে আছেন এক রাজা। নীচের কোর্টে রাজা জিতেছিলেন.... তাই বিহারীলাল সে-রায়ের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করেছেন এলাহাবাদ

হাইকোর্টে…কাল সে-আপীলের শুনানি। বিহারীলাল বললেন—এ-মামলার ফলাফল কি হবে, সাধুজি ?

সাধু বললেন—কাল বেলা সাড়ে দশটার সময়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন….মনে করে।

মহাভারতী লিখেছেন—পরের দিন ঘড়িতে দশটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে সাধুজী ঢুকলেন ছোট একটি ঘরে….ঢুকে ভিতর থেকে ঘরের দরজা-জানলা দিলেন বন্ধ করে। আমাদের তিনি বললেন—তোমরা এ-ঘরের একটা জানলার ধারে বাহিরে বসে থাকো। আমরা তাই বসলুম। সেখান থেকে দেখা যায় না, ঘরের মধ্যে কি হচ্ছে….তবে কাণে শুনছিলুম, খুব দীর্ঘ কথোপকথন চলেছে ঘরে। কথা কইছেন একদিকে আমাদের সাধুজী….অপর পক্ষের কণ্ঠ আমাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত। কথা শুধু শুনছিলুম….তার ভাষা বুঝিনি।

প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে ঘরের ভিতর থেকে সাধুজী বললেন আমাদের ডেকে বেশ উচ্চকণ্ঠে—জজেরা এজলাসে এসে বসেছেন….বিহারীলালের কৌশুলী হাজির….কিন্তু রাজার পক্ষের কৌশুলীকে দেখছি না। জজেরা তাঁর জন্য অপেক্ষা করছেন। পনেরো মিনিট পরে সাধুজী বললেন—রাজার কৌশুলী এসেছেন। বিহারীলালের কৌশুলী বক্তৃতা সুরু করেছেন। আরো এক ঘণ্টা পরে সাধুজী বললেন….তাঁর বক্তৃতা শেষ….রাজার কৌশুলী বক্তৃতা সুরু করলেন। আরো ঘণ্টাখানেক পরে সাধুজী বললেন—রাজার কৌশুলীর বক্তৃতা শেষ হয়েছে….জজেরা উঠে তাঁদের খাশ কামরায় গেলেন….ফিরে এসে হুকুম দেবেন। এবং আরো প্রায় পঁয়তাল্লিশ

মিনিট পরে সাধুজী বললেন—জজেরা ফিরেছেন....রায় দিচ্ছেন....রাজার জিত....আপীল ডিসমিস।

বিহারীলাল বিমর্ষ হলেন। সাধুজী বললেন—ভেবো না....তুমি প্রিভিকৌন্সিল করো....তোমার জিত নিশ্চিত।

বিহারীলাল এ-কথা মেনে প্রিভিকৌন্সিলে আপীল করেছিলেন এবং সে-আপীল তিনি জিতেছিলেন।

সাধুজী সেদিন বন্ধ কামরা থেকে বেরিয়ে আসতে তাঁকে প্রশ্ন করা হলো—আপনি কি করে এত বৃত্তান্ত জানলেন?

সাধুজী জবাব দিলেন—শুধু তন্ত্রোক্ত দৃষ্টিযোগ আর আলোকযোগ সাধন-অভ্যাসের গুণে।

তিন

তন্ত্র ও তান্ত্রিক

তন্ত্রশাস্ত্র এবং তান্ত্রিক····এ সম্বন্ধে ছোটবেলা থেকে আমরা কত না কথা শুনে আসছি। শুনি, তান্ত্রিকদের অসাধারণ শক্তি····তাঁরা নয়কে হয় করতে পারেন, হয়কে নয় করতে পারেন। তাঁদের সাধনার পদ্ধতি শুধু ভয়ের ব্যাপার নয়···সে-সাধনায় দারুণ বিপদের আশঙ্কা।

বাঙলা দেশে সেকালে ছিলেন প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক শোভাকর ভট্টাচার্য্য ···তাঁর ছিল দুটি 'ভূত'····কানু এবং কিশোরী। মহারাজা বিক্রমাদিত্যের তাল-বেতালের মতোই তাদের দিয়ে অসাধ্য সাধন করানো হতো। কোথায় সে কানু আর কিশোরীর কাহিনী? পারস্যের সিদ্ধ তান্ত্রিক ভূশের খাঁর নাম ইতিহাস প্রসিদ্ধ। রাণী ভবানীর দত্তক পুত্র রাজা রামকৃষ্ণ ছিলেন তন্ত্রসিদ্ধ। তাঁর ছিল দুটি 'পোষা' ভূত····গোবরা এবং হীরালাল।

সিদ্ধ সাধকদের আহ্বানমাত্র প্রেতের আবির্ভাব ঘটে····তাছাড়া নিজেদের খেয়ালেও তারা আবির্ভূত হয়। তন্ত্র সাধক গুণাধিপতি স্বামীজীর কথা পূর্ব্বে বলেছি····গোয়ালিয়রের মন্ত্রী স্যর দিনকরের প্রসঙ্গে···· এখন আরো দু-একটি কাহিনী বলি :—

এ-কাহিনীগুলি পণ্ডিত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতীর গ্রন্থ থেকে সঙ্কলিত হলো।

পণ্ডিত মহাভারতী মহাশয় লিখেছেন—গঙ্গার ধারে আজিমগঞ্জ····

মুর্শিদাবাদ জেলার বর্দ্ধিষ্ণু সহর। এখানে প্রসিদ্ধ ধনী জমিদার রায় বাহাদুর সিতার চাঁদ নাহারের বাস। জমিদারী ছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্যেও সমৃদ্ধ রকমের। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র পুরণচাঁদ হাইকোর্টের উকিল। পুরণচাঁদের স্ত্রীর হলো খুব অসুখ....ওখানকার দেশী এবং ইংরাজ ডাক্তাররা চিকিৎসা করেন…কিন্তু তাতে রোগের উপশম হওয়া দূরে থাকুক, অসুখ খুব বেড়েই চললো। তখন কলকাতায় তাঁকে এনে চিকিৎসার ব্যবস্থা—রায় বাহাদুর ক্লাইভ ষ্ট্রীটে মস্ত বাড়ী ভাড়া করলেন ....সে-বাড়ীতে রুগ্না বধূকে নিয়ে এলেন এবং সেই সঙ্গে পরিবারের আত্মীয়জনরা সকলেই এলেন। ইংরেজ ডাক্তার, বাঙালী ডাক্তাররা দেখলেন....তার পর কবিরাজ বিজয়রত্ন সেনের চিকিৎসায় তাঁকে রাখা হলো। দীর্ঘকাল চিকিৎসা করে বিজয়রত্ন সেন মহাশয় বললেন—দুরারোগ্য....hopeless case. তখন আজিমগঞ্জে ফিরে যাওয়া স্থির হলো এবং কলকাতার ভাড়া বাড়ী ত্যাগ করে তাঁরা সকলে আজিমগঞ্জে চলে গেলেন।

মহাভারতী মহাশয় লিখেছেন—সে-সময় এক হপ্তা কলকাতায় তাঁর গৃহে আমি আতিথ্য গ্রহণ করে বাস করছিলুম। তাঁরা আজিমগঞ্জে গেলেন…আমিও সেখান থেকে পুরীধামে গেলুম। পুরীতে পনেরো-কুড়িদিন থাকবার পর আমি ফিরলুম আজিমগঞ্জে তখন রায় বাহাদুর এবং তাঁর দেওয়ান আমাকে অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন, পুত্রবধূর আরোগ্যের জন্য তান্ত্রিকযোগ করবার জন্যে। আমি প্রথমে রাজী হইনি....কিন্তু তাঁদের আগ্রহাতিশয্যে শেষে সম্মত হলুম।

পূজা যাগানুষ্ঠানের জিনিষপত্র গোপনে সংগৃহীত হলো এবং সন্ধ্যা

সাতটার পর রায় বাহাদুরের দেওয়ান লালা করমচাঁদের সঙ্গে ঘাটে গিয়ে বোটে উঠলুম—রায় বাহাদুরের নিজস্ব বোট···এজন্য তৈরী রাখা ছিল। বোটের দাঁড়ি-মাঝি ছিল চারজন। বোটে জিনিষপত্র তুলে আমরা চললুম ওখানকার শ্মশান-ঘাটে। শ্মশানঘাট ও-ঘাট থেকে দু'মাইল দূরে।

অমাবস্যা তিথি····ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। শ্মশানে পৌঁছুলে দেওয়ান বাহাদুর মাঝিদের বললেন জিনিষপত্র অর্থাৎ পূজার উপকরণাদি শ্মশানে নামাতে। নামানো হলে আমি তাঁকে বললুম, মাঝিদের নিয়ে বোট নিয়ে বাড়ী ফিরতে। তিনি বললেন, বোট কখন আসবে আমাকে নিয়ে যেতে? আমি বললুম—কাল সকালে।

বোট নিয়ে তাঁরা চলে গেলেন। পূজার আয়োজন করে আমি স্নান করলুম—শীতের রাত····তার উপর উত্তরে বাতাস বইছে····সব ঠাণ্ডা কনকন করছে····যেন বরফ!

নির্জ্জন শ্মশান···কাছাকাছি বহু দূর পর্য্যন্ত লোকজনের বসতি নেই। আমি পূজায় বসলুম—পূজার প্রথম পর্ব্ব সারা হলো নিরুপদ্রবে। তার পর দ্বিতীয় পর্ব্ব সুরু····অগ্নিকুণ্ডে আগুন জ্বলছে····আলোয় বহু দূর দেখা যায়। দ্বিতীয় পর্ব্ব পূজা সুরু করেছি····দেখি, বালি মাটি ফুঁড়ে দলে দলে কাঁকড়া আসছে। কোনোমতে তাদের তাড়ানো গেল। তার পর দেখি, বিছে আর টিকটিকির পাল····আমার আশেপাশে। অনেক কষ্টে তাদেরও তাড়ানো গেল—তার পর পূজার দ্বিতীয় পর্ব্ব শেষ করলুম। এর পর তৃতীয় পর্ব্ব সুরু····দেখি, এত বড় একটা ব্যাঙ···· বাঙলা দেশে তেমন বড় ব্যাঙ কখনো আগে দেখিনি····দেখা যায়

বলে শুনিনি…দেখি, ব্যাঙটা আসছে থপ থপ করে আমার দিকে আর তার পিছনে প্রকাণ্ড এক সাপ—সাপটা আসছে ব্যাঙের পিছনে ব্যাঙকে তাড়া করে। দেখে অগ্নিকুণ্ড থেকে জ্বলন্ত একখানা বাঁশ 'নয়ে তাদের দিকে ছুড়লুম….সাপ-ব্যাঙ দুই পালালো।

পূজার পর আমি যখন তান্ত্রিক সাধনায় বসছি….তখন কোথা থেকে কতকগুলো কুকুর আর শেয়াল এলো—কুকুর আর শেয়ালের এমন মিতালী দেখা যায় না। তাদের কী চীৎকার…শুধু চীৎকার নয়, তেড়ে আসে আমার দিকে। তাড়াবার যত চেষ্টা করি, তারা যায় না….অথচ আমি সাধনায় বসেছি….উঠবার জো নেই….উঠা মানা …সব পণ্ড হবে। বসে বসে কখানা জ্বলন্ত বাঁশ ছুড়তে লাগলুম… তখন তারা পালালো।

তার পর আমার পূজা আর সাধন শেষ….রাত তখন দুটো। এবারে দর্শন মিলবে….হঠাৎ শুনি, খড়খড় শব্দ….চেয়ে আমার মাথা ঘুরে গেল। উঠে দাঁড়ালুম….পা টলছে….সারা দেহ অবশ… যেন মদ খেয়ে মাতাল হয়েছি। জীবনে আমি কখনো সুরা স্পর্শ করিনি….কিন্তু তখন আমার অবস্থা মাতালের মতো টলমলে। চেয়ে দেখি, সামনে দীর্ঘ এক মূর্ত্তি…কালো কুচকুচ করছে গায়ের রঙ….মাথায় লম্বা চুল…. দুটো চোখ জ্বলছে যেন আগুনের ভাঁটা। উলঙ্গ….লোকটা লম্বা যেন তাল গাছ….সিড়িঙ্গে দেহ। যেন তাল গাছ…ঘের নেই….শুধু লম্বা! তার হাতে লোহার এক ডাণ্ডা….সে বেশ কর্কশ রূঢ় স্বরে বললে— কেন কষ্ট করছো? সে বাঁচবে না….আজ থেকে ৩৭ দিনের দিন মারা যাবে।

আমি বললুম—তার মরণের দিন জানবার জন্য তোমাকে এত সাধ্য-সাধনা করে ডাকিনি। তোমাকে ডেকেছি····যাতে সারে, তার উপায় বলে দাও।

সে যেন রাগে জ্বলে উঠলো····বললে—না, না, না····সে কিছুতে বাঁচবে না····আজ থেকে ৩৭ দিনের দিন সে মারা যাবে। এর অন্যথা হবে না।

আমি মিনতি জানালুম····সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথার চুলের ঝুঁটি ধরে এমন জোরে আমাকে টানলো যে আমি অজ্ঞান।

জ্ঞান হতে দেখি, রোদ উঠেছে—আমি পড়েছি····শ্মশান থেকে অনেক দূরে····শ্মশান ঘাটের পথে একটা গাছতলায়।

দেওয়ান বাহাদুর এসেছেন····তিনি বললেন—শ্মশানে আপনাকে না পেয়ে খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসে দেখি, গাছতলায় শুয়ে ঘুমোচ্ছেন।

ঘুম নয়····আমি তা জানি। কিন্তু আশ্চর্য্য হলুম—কোথায় সে পূজন-সাধনের জায়গা····আর সেখান থেকে এত দূরে আমি এসে পড়ে আছি····কে আমাকে এখানে নিয়ে এলো?

যাই হোক, রায় বাহাদুরের পুত্রবধূ সেদিন থেকে সাঁইত্রিশ দিনের দিনেই মারা গেলেন।

চার

তান্ত্রিক সাধনার ফলে

পণ্ডিত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয়ের তন্ত্র সাধনার আর একটি কাহিনী বলি ঃ—

মহাভারতী মহাশয় লিখেছেন—

ক বছর আগেকার কথা....আমি তখন পাঞ্জাবের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। একদিন সকালে আম্বালা ষ্টেশনে নামলুম ট্রেন থেকে.... ষ্টেশনে নেমে ক্যান্টনমেণ্টে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হলুম।

রাজকৃষ্ণবাবু তখন পরলোকে....তাঁর কৃতী কজন পুত্র বর্ত্তমান। বড় পঞ্চানন এম-এ পাশ। মেজো দুর্গাচরণ ডাক্তার। সেজো কালীকৃষ্ণ বিখ্যাত এঞ্জিনীয়ার....পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্টে চাকরি করেন। ছোট শ্যামাচরণ....শ্যামাচরণ ক্যাণ্টনমেণ্ট ইংলিশ স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা এবং পরিচালক। তাছাড়া ওখানকার গ্লাস ফ্যাক্টরির ডাইরেক্টর এবং রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কোম্পানির ম্যানেজিং প্রোপ্রাইটর।

এই ব্যবসাটির নানা বিভাগ—মেডিকেল, ষ্টেশনারি, ছাপাখানা, কমিশন-এজেন্সি প্রভৃতি এবং মেডিকেল বিভাগের চার্জ্জে আছেন তখন তরুণ-বয়সী পাঞ্জাবী ভদ্রলোক....তাঁর নাম ডক্টর ভগৎরাম। ভগৎরামবাবু যেমন অমায়িক, সরল....তেমনি পরোপকারী।

আমি তখন ওখানে আছি....এমন সময়ে এক ঘটনা। অর্থাৎ

ওখানকার ক্যান্টনমেণ্টের ব্রিটিশ ফৌজের এক ক্যাপটেন সাহেবের স্ত্রীর হলো কলেরা....তাঁরা চিকিৎসার জন্য ভগৎরামকে নিয়ে গেলেন। রোগী দেখে ভগৎরাম প্রেশক্রুপশন লিখে বাড়ী ফিরলেন। ক্যাপটেন সাহেব তাঁর বেয়ারাকে দিয়ে ডাক্তারখানা থেকে সে-প্রেশক্রুপশনের ঔষধ আনালেন (ঔষধ আনা হলো অন্য ডাক্তারখানা থেকে)। স্ত্রীকে সে-ঔষধ খাওয়ানো হলো....কিন্তু ঔষধ খাওয়ানোর পর 'উলটো উৎপত্তি'। স্ত্রীর তলার পেট ফুলে জয়ঢাক....অসহ্য যাতনা....নাড়ীর গতি হলো দ্রুত....টেমপারেচার দারুণ বেশী এবং হার্টফেল হয়ে স্ত্রীর হলো শেষরাত্রে মৃত্যু।

ক্যাপটেন সাহেব খাপ্পা—দেশী ডাক্তারের বাজে ঔষধে স্ত্রীর মৃত্যু ....তিনি খবর দিলেন সাহেব পুলিশ-সুপারিনটেণ্ডেণ্টকে। মেমসাহেবের মৃত্যু....দেশী লোকের ঔষধে....পুলিশ তখনি গ্রেফতার করলো ভগৎরামবাবুকে—জামিন দেবে না এবং পুলিশ লাগালো জোর তদন্ত। ক্যান্টনমেণ্টের যত গোরা, ওখানকার যত ইংরেজ বাসিন্দা একেবারে মারমূর্ত্তি....লোকটাকে সাজা দিয়ে আন্দামানে দ্বীপান্তরী করতে হবে।

ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে পুলিশ দিলে আসামীকে চালান করে বিচারের জন্য। সেখানে মুখুয্যে মশায়দের পয়সায় কৌশুলী এবং তাঁদের প্রতিপত্তি—এই দ্বিবিধ বলে ডাক্তারের জামিন মিললো ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে....পাঁচ হাজার টাকার জামিনে ভগৎরামবাবু রইলেন খালাশ!

ম্যাজিষ্ট্রেট সাক্ষ্যসাবুদ নিয়ে মকৰ্দ্দমাটি পাঠালেন সেশন্স কোর্টে। গোরা ফৌজ এবং ইংরেজ বাসিন্দারা একযোগে চান আসামীর সাজা।

সেশন্স কোর্টে মামলা সোপর্দ্দ হলে ভগৎরামবাবুর বাবা কেঁদে মহাভারতী মহাশয়কে ধরলেন—আমি আর আমার স্ত্রী বুড়ো হয়েছি···· ছেলের রোজগার সম্বল····সংসারে তার স্ত্রী, তার ছেলেমেয়ে····ছেলের কি দোষ বলুন! ডাক্তারখানা থেকে কি ঔষধ দিতে কি দিয়েছে···· আমার ছেলের কি অপরাধ! আপনি দয়া করে তান্ত্রিক সাধনা করুন ····করে ছেলেকে বাঁচান, আমাদের সকলকে বাঁচান, সংসারটাকে রক্ষা করুন।

মুখুয্যে মশায়রাও বললেন—ভগৎরাম নির্দ্দোষ····সাহেবদের অন্যায় জেদ শুধু।

মহাভারতী মহাশয় তখন তান্ত্রিক মতে শব-সাধনা করলেন।

রাত্রি দশটা····সারা সহর তখন নিশুতি····মহাভারতী মহাশয় এবং ভগৎরামের পিতা দুজনে পূজার উপকরণাদি নিয়ে ওখানকার শ্মশানে গেলেন—অতি কষ্টে মড়ার খুলি সংগ্রহ হলো।

শ্মশানে পূজার আয়োজন করে মহাভারতী বললেন ভগৎরামের পিতাকে—আপনি এখানে থাকবেন না····আমার সাধনা দেখবেন না···· দেখলে সব মিথ্যা হবে। আপনি বাড়ী যান····কাল সকালে আসবেন।

তিনি বললেন—বাড়ী যাবো না। কাছে লালা মঙ্গল সিংয়ের বাড়ী ····আমি সেইখানে থাকবো এ-রাত্রে!

এ-কথা বলে তিনি বিদায় নিলেন····কিন্তু মঙ্গল সিংয়ের বাড়ী গেলেন না····শ্মশানেই রইলেন একটা ঝোপের পিছনে লুকিয়ে····সাধনা দেখবেন বলে।

মহাভারতী মহাশয় তা জানলেন....তিনি যথারীতি অগ্নিকুণ্ড জ্বেলে, যথারীতি পূজন-সাধনে বসলেন।

মহাভারতী মহাশয় লিখেছেন—আমার পূজা অর্দ্ধেক সারা হয়েছে ....অগ্নিকুণ্ডে ধূনাগন্ধক দেবো বলে গন্ধক গুড়োলুম....গুড়িয়ে অগ্নিকুণ্ডে দিলুম। আমি যখন এই কাজ করছি....তখন যে মড়ার খুলিটি রেখেছিলুম আমার আসনের সামনে....দেখি, সে-খুলি সেখানে নেই.... নিরুদ্দেশ! আমি অবাক! শেয়াল এলো না, কুকুর এলো না... সে-খুলি তারা নিতে পারে না। মুস্কিল হলো, আসন ছেড়ে আমি উঠে খুঁজতেও পারি না। তখন কি করি....শঙ্খ নিয়ে mystically সেটি বাজাতে লাগলুম এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখি, কাছের একটা গাছের ডাল থেকে সে-খুলি ঝুপ করে মাটীতে পড়লো। সেটা পড়লো আমার আসন থেকে বেশ খানিক দূরে...আমি নাগাল পাই না—অথচ আনতে গেলে আমাকে আসন ত্যাগ করে বেরুতে হয়....তাও পারি না....সব পণ্ড হবে। তখন আমি আসনে বসে অন্য তান্ত্রিক ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হলুম....প্রবৃত্ত হবামাত্র দেখি, খুলিটা গড়াতে গড়াতে এসে ঝাঁপ দিয়ে আমার কোলে উঠলো।

তার পর পূজা শেষ করে সাধন....সাধনা করছি....দেখি, অদ্ভুত চেহারার এক জোয়ান মানুষ এসে সামনে দাঁড়ালো....তার হাতে একখানা বড় ছোরা। তার চেহারা....আমি টাশমানিয়ায় থাকতে সেখানকার বুনো মানুষ দেখেছিলুম....অবিকল টাশমানিয়ার সেই বুনো মানুষের চেহারা। ছোরা দেখিয়ে সে আমাকে শাসাতে লাগলো। আমি তার নাম জিজ্ঞাসা করলুম....সে কোনো জবাব দিলে

না....ছোরা নিয়ে এক পা এক পা করে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো।

ঠিক এই সময়ে এক কাণ্ড—ডাক্তারের বাপ লুকিয়েছিল ঝোপের আড়ালে (অবশ্য আমি তা জানতুম না)....সে ঐ ব্যাপার দেখে আমাকে রক্ষা করবে বলে একটা ডাণ্ডা নিয়ে এলো তেড়ে....বললে—ডাকু! ডাকু! এ-কথা বলে সে তুললো তার ডাণ্ডা....সঙ্গে সঙ্গে সে-মূর্ত্তি বাতাসে মিলিয়ে গেল।

আমি তাঁকে খুব ভর্ৎসনা করলুম....বললুম—সব পণ্ড করে দিলেন ....ছি ছি!

তিনি লজ্জা পেয়ে ভয় পেয়ে চলে গেলেন।

তখন আবার আমি সাধনে বসলুম এবং স্পিরিটের দেখা মিললো ....রাত তখন তিনটে বেজে গিয়েছে। স্পিরিটকে নিবেদন জানাতে জবাব পেলুম—কোনো ভয় নেই। ভগৎরাম বেকশুর খালাশ পাবে আজ থেকে ন'দিনের দিনে।

তার পর সেশন্স কোর্টে মামলার তারিখ....সে-রাত্রি থেকে ঠিক ন দিনের দিনে। কাছারি লোকে লোকারণ্য....ইংরেজের দল বাড়ী ছেড়ে বুঝি সকলে কোর্টে হাজির। এসে নিজেদের আসনে বসলেন.... জজ সাহেব এসে এজলাশে বসলেন....তিনি এজলাশে ঢুকলেন এ-মামলার নথীপত্র নিয়ে। এজলাশে বসেই পুলিশকে ভর্ৎসনা.... ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর বিরক্তি প্রকাশ। জজ সাহেব বললেন—এ-মকর্দ্দমার সমস্ত নথীপত্র আমি বার বার তিনবার আত্মোপান্ত পড়ে দেখেছি। আসামীর প্রেসক্রপশন is all right....তাঁর প্রেসক্রপশনে কোনো

গলদ নেই। ওষুধ এসেছে অন্য ডাক্তারখানা থেকে····সে-ডাক্তারখানার সঙ্গে আসামীর কোনো যোগ নেই। এ-ব্যাপারের সঙ্গে ডাক্তারকে যোগ করবার মতো not an iota of evidence····পুলিশের অকর্ম্মণ্যতা প্রকাশ পাচ্ছে আসামীকে প্রমাণের অভাবে গ্রেফতার করার এবং ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে বিচারের জন্য পাঠানো। ম্যাজিষ্ট্রেট অনর্থক সরকারী সময়ের অপব্যবহার করেছেন····এ-মামলা তাঁর পত্রপাঠ ডিসমিস করা উচিত ছিল। তিনি কি বলে এ-মামলা সেশন্সে পাঠালেন, বুঝি না। এ-মামলা শুনতে গেলে অনর্থক সময় নষ্ট····কোর্টের সময় অপব্যয় করার মতো নয়। এ-প্রমাণে এ-মামলা চলতে পারে না। রেকর্ডে যে সাক্ষ্যপ্রমাণ রয়েছে, তাতে এ-মামলার no legs to stand upon····অতএব আসামী বেকশুর খালাশ।

পাঁচ

শুকদেও স্বামী

বিজয়বাবু একটি কাহিনী বলেছিলেন....তাঁর প্রত্যক্ষ করা। এটি এক যোগীর কাহিনী....তান্ত্রিকের অলৌকিক শক্তির কাহিনী।

আজ আমাদের ছন্নছাড়া অবস্থার দিনে আমরা সাধু-সন্ন্যাসী-যোগী বা দেবতার কথা চিন্তা করতে ভুলে গিয়েছি....অন্নের জন্য আমাদের মতো সাধারণ মানুষের আর সব চিন্তা ডুবে গিয়েছে। তবু আজো যোগীর যোগবল উবে যায়নি....তার পরিচয় পাওয়া যাবে বিজয়বাবুর এ-কাহিনীতে।

তিনি বললেন—ঘুরতে ঘুরতে ঐ আগ্রাজেলার আরো উত্তরে এক সাধুর আশ্রমে আশ্রয় পেয়েছিলুম....লোকালয়ের বাহিরে নদীর ধারে আশ্রম। নদীর ওপারে বড় সহর (তিনি নদী এবং সহরের নাম বলেছিলেন....সে-নাম মনে পড়ছে না)। সাধুর নাম শুকদেও স্বামী।

সে-রাত্রি ঘুমে কাটলো। সাধু বললেন, পাঁচ-সাতদিন এখানে থাকো। আমি রাজী হলুম। সাধু খেতে দেন নানা ফল, মিষ্টান্ন! আমি আশ্চর্য্য হই, সাধু কোথা থেকে পান টাটকা ফল? টাটকা মিষ্টান্ন?

পরের দিন বুঝলুম....দেখি, তাঁর লম্বা কমণ্ডলুটি মাথায় দিয়ে তিনি বেরুলেন আশ্রম থেকে....গেলেন নদীতে। তার পর দেখি, নদীর জলের উপর পা চালিয়ে তিনি নদী পার হচ্ছেন...অর্থাৎ ডাঙ্গাপথে যেমন চলি-

আমরা, তিনি নদীর বুকের উপর দিয়ে তেমনি চলেছেন। দেখে আমি বিস্ময়ে নির্বাক, স্তম্ভিত। সাধু হঠাৎ পিছন দিকে ফিরলেন....আমাকে দেখলেন....যেমন আমায় দেখা, তিনি জলে ডুব দিলেন—তার পর অদৃশ্য।

আমি ভাবলুম, হয়তো আমার অপরাধ হয়েছে...উনি ভেবেছেন, আমি ওঁর গতিবিধি লক্ষ্য করছি। লজ্জা হলো, কুণ্ঠা হলো....আমি আশ্রমের ভিতরে এসে বসলুম।

আমার বসার পর পাঁচ মিনিট কাটলো না....সাধু এলেন....ডাকলেন—বেটা, নে....খা।

দেখি, টাটকা এত ফল....আর বিবিধ মিষ্টান্ন।

বুঝলুম, যোগবল....যোগবলে সাধু চকিতক্ষণে নদীর ওপারে সহরে গিয়ে সেখান থেকে এ-সব নিয়ে এসেছেন।

তার পর শুকদেও স্বামীর আর একটি ব্যাপার :—

পরের দিন....গভীর রাত্রি....আমি ঘুমোচ্ছি—সাধু আর আমি একঘরে শয়ন করি। আমার ঘুম হঠাৎ ভেঙ্গে গেল....ঘুম ভাঙ্গতে শুনি, আশ্রমের বাহিরে বড় কুয়া....বাঁধানো কুয়াতলা....সেই কুয়াতলায় কে যেন স্নান করছে—বালতির পর বালতি ভরা জল তুলে সেই জল ঢেলে স্নান।

এত রাত্রে কে স্নান করে? সাধুজী? কিন্তু না....সাধু ঐ ঘুমোচ্ছেন তো....নিঃশব্দে।

বাহিরে এলুম....জ্যোৎস্না রাত....দেখি, জনমানব নেই! আমি বাহিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে জল ঢালা থামলো। আমি আবার ঘরে

এলুম।

পরের দিন দুপুর বেলায় ও-দেশী এক ভদ্রলোক এসে সাধুকে প্রণাম করে বললেন—আপনি কবে ফিরলেন প্রয়াগ থেকে?

সাধু বললেন—আজ সকালে।

কথাটা আমার কাণে গেল। তখন এ-সম্বন্ধে কোনো কথা বললুম না....পরে সে-ভদ্রলোককে একান্তে পেয়ে আমি প্রশ্ন করলুম—আপনি যে ও-কথা জিজ্ঞাসা করলেন, কবে উনি এলেন? এর মানে?

তিনি বললেন—উনি প্রয়াগে স্নান করতে গিয়েছিলেন...যোগে।

আমি বললুম—কবে?

তিনি বললেন—তিন দিন আগে ওঁর সঙ্গে আমার দেখা প্রয়াগের ঘাটে....উনি যোগে স্নান করতে গিয়েছিলেন।

আমি বললুম—বলেন কি! আমি কদিন এখানে রয়েছি....ওঁকে দেখছি....এর মধ্যে প্রয়াগে গেলেন কি করে? প্রয়াগ তো কাছে নয় ....ট্রেনে যেতে-আসতে একটা করে দিন লাগে।

তিনি বললেন—বায়ুপথে চলেন....এমন আশ্চর্য্য ওঁর ক্ষমতা!

কথা শুনে আমার বিস্ময়ের সীমা রইলো না। এমন ক্ষমতা সাধুর.... অথচ এখানে একলা এমন করে পড়ে আছেন—কার জন্য? কিসের সন্ধানে? কিসের প্রত্যাশায়?

ছয়

তন্ত্রশক্তি

উত্তরপাড়া-বালির, বালি কালীমন্দিরের পণ্ডিত কাশীনাথ নন্দ ব্রহ্মচারী ১৯০৯ সালের ডিসেম্বর সংখ্যা Hindu Spiritual Magazine পত্রিকায় একটি পত্র লিখে জানিয়েছিলেন, কি করে তন্ত্রশাস্ত্রে তাঁর অনুরাগ সঞ্চারিত হলো। পরে তিনি তন্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন।

সে-পত্রে তিনি লিখেছিলেন—একটা জটিল ফৌজদারী মকর্দ্দমার সম্বন্ধে আমি আমূল বিবরণ পড়ি। বিচক্ষণ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রচন্দ্র শীল মহাশয় তখন রাজসাহীর ডিষ্ট্রিক্ট এবং সেশন্স জজ।

রাজসাহীতে দুপক্ষ জমিদারে ছিল ভয়ানক রেষারেষি....সেই রেষারেষির ফলে হয়েছিল দারুণ দাঙ্গা-হাঙ্গামা। সে-হাঙ্গামায় একটি লোক খুন হয়। একপক্ষের নিকট-আত্মীয়েরা নিহত লোকটিকে সনাক্ত করে....তার পর দুপক্ষকেই দাঙ্গার চার্জ্জে পুলিশ চালান দেয় কোর্টে বিচারের জন্য এবং যে-পক্ষের মানুষ খুন হয়েছিল, তার অপর পক্ষের কজনের নামে পুলিশ দায়ের করে খুনের মামলা। খুনের মামলা দায়রা সোপর্দ্দ হলে সে-মামলার বিচার করেন দায়রা-জজ ব্রজেন্দ্রচন্দ্র শীল মহাশয়।

দুপক্ষ কলকাতা হাইকোর্টের ওস্তাদ উকিল ব্যারিষ্টার দিয়ে মামলা লড়েন....খুনী মামলায় দু পক্ষের সওয়াল-জবাব-বক্তৃতাদি শেষ হলো।

দুপক্ষের সওয়াল জবাব বক্তৃতা প্রভৃতি রীতিমত জোরালো যুক্তিপূর্ণ....জজ পড়লেন চিন্তায়—এ-মামলার কি রায় দেবেন? বাড়ীতে নথিপত্র এনে তিনি বারবার মনোযোগ দিয়ে সব পড়লেন....তবু সমস্যা ভঞ্জন হয় না। মন অত্যন্ত চঞ্চল—তাইতো, বিচারের নামে অবিচার না করে বসি।

নথিপত্র রেখে বিছানায় শুলেন....শেষরাত্রে ভালো ঘুম হলো না। ভোর হবামাত্র তিনি বিছানা ছেড়ে উঠলেন....উঠে বাংলোর বারান্দায় পায়চারি করছেন এবং চিন্তা করছেন দু পক্ষের জোরালো 'পয়েণ্ট'গুলোর সম্বন্ধে....হঠাৎ তাঁর চোখ পড়লো বারান্দার নীচে লনের এক জায়গায়। নজর পড়তে তিনি দেখেন, একখানা তক্তা পাতা....আর তক্তার উপর পাঁচ-পাঁচটা মড়ার মাথা—শুধু হাড়ের খোলাগুলো।

তিনি চমকে উঠলেন....ভাবলেন, কোনো বদমায়েস লোক ভয় দেখাবার জন্য ফেলে দিয়ে গিয়েছে! তিনি লোকজন ডেকে বললেন.... সেগুলোর ব্যবস্থা করতে। সেইদিনই তাঁকে রায় দিতে হবে—চা পান করে আবার বসলেন নথিপত্র নিয়ে। হঠাৎ মনে পড়লো, নিহত লোকটির তলপেটের নীচে বড় অপারেশন হয়েছিল। এ-কথা মনে হতেই তিনি সত্যদর্শন করলেন এবং মনস্থির করে ফেললেন এবং সেইভাবে লিখলেন এ-খুনী মামলার রায়।

রায়ে অবশ্য ও-কথার ইঙ্গিত দিলেন না....কিন্তু দোষীর তিনি দণ্ড দিলেন। হাইকোর্টে তাঁর রায়ের বিরুদ্ধে আপীল চললো....কিন্তু আপীল হলো ডিসমিস এবং ব্রজেন্দ্র শীল মহাশয়ের আদেশ বাহাল রইলো।

মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হলে তিনি সন্ধান নিলেন, কি করে ও-

মাথাগুলো তাঁর বাংলোয় এসেছিল। যে-পক্ষ জিতেছিল....তাদের উকিলের কাছে শুনলেন, তাঁর মক্কেলরা যাতে এ-মামলার সুবিচার হয়, তার জন্য গুণী তান্ত্রিককে দিয়ে যাগযজ্ঞ করিয়েছিল—যাতে হাকিম সত্য নির্দ্ধারণ করতে পারেন।

জজ শীল মহাশয় তখন স্বীকার করেন যে সে-মাথাগুলো দেখেই তাঁর মনের পটে আসল সত্য প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে....তখন তিনি দোষী সাব্যস্ত করে দণ্ডাজ্ঞা দেন। তিনি বলেছিলেন, হাইকোর্ট তাঁর রায় বাহাল রাখার ফলে তন্ত্রশাস্ত্রে তারো হয়েছে বিশ্বাস!

সাত

সিদ্ধপুরুষ

১৮৯২ সালের কথা: দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী তখন বিজনোর (বেহার) জেলার ডিষ্ট্রিক্ট এঞ্জিনীয়ার। বেরিলি-পিলিবিট ষ্টেট রেলোয়ের নির্ম্মাণ-কার্য্য সুরু হয়েছে....সে-কাজের ভার পড়লো তাঁর উপর। তখন হরিদ্বার-যাত্রীদের হরিদ্বার যেতে হলে বিজনোর হয়ে কনখলে গঙ্গার উপর ব্রিজবোট তৈরী হতো....সেই ব্রিজবোটের উপর দিয়ে নদী পার হতে হতো। এই ব্রিজবোট বহু বৎসর পূর্ব্বে তৈরী হয়েছিল—স্নানের যোগ আসন্ন....যাত্রী আসবে দলে দলে....সে-ব্রিজ কেমন মজবুত, তাই পরীক্ষা করবার জন্য তাঁর যাওয়া।

লোকজন নিয়ে তিনি গেলেন....ছাউনি পড়লো....ব্রিজ পরখ হচ্ছে.... যাত্রীরা স্নানে আসবে....তারা স্নানাদি করবে—তার পর তারা চলে গেলে তবে তার ছুটী মিলবে।

এদিককার পরীক্ষার কাজ চুকলে দুর্গাচরণবাবুর কি খেয়াল হলো, তিনি নদীর ওপারে যে বনরাজি-শোভিত দীর্ঘ হিমালয় গিরিশ্রেণী....নদী পার হয়ে সেই হিমালয়ে উঠবেন—ওখানে নিশ্চয় এমন সাধু-সন্ন্যাসীর দেখা মিলবে, যাঁর উপদেশে তিনি কৃতকৃতার্থ হবেন।

গেলেন তিনি ওপারে। গিয়ে পাহাড়ে চড়া। তিনি লিখেছেন—নীচের দিক থেকে উপরে উঠতে শুধু শালগাছ আর শালগাছ.... পাশাপাশি ঘেঁষাঘেষি শালগাছ....মাথায় খুব দীর্ঘ নয়....দেড় মানুষ,

দু মানুষ ভোর উঁচু। নীচে থেকে দেখলে শোভামাধুরীর অভাব....কিন্তু যত উপরে উঠতে লাগলেন, বন হতে লাগলো গভীর এবং গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে নীচে চারিদিকে চেয়ে দেখলে শোভা-মাধুরীর বৈচিত্র্যে নয়ন-মন ভরে যায়। দেখতে দেখতে তিনি উঠচেন, উঠচেন....এক জায়গায় এসে দেখেন, সামনে খানিক দূরে প্রকাণ্ড একটা গাছের মোটা ডাল একবার নামছে, পরক্ষণে উঠছে! তাঁর সর্ব্বাঙ্গে রোমাঞ্চ! ব্যাপার কি ?

তিনি সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন....গিয়ে দেখেন, গাছের ডাল ধরে দাঁড়িয়ে এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী....পরণে কৌপীন, সারা অঙ্গ ভস্ম-লেপিত....সন্ন্যাসীর বয়স কত, অনুমান করা কঠিন। গাছতলায় কাঠ জ্বলছে....চমৎকার সুরভিতে বাতাস পরিপূর্ণ।

দুর্গাচরণবাবু ভক্তিভরে তাঁকে প্রণাম করলেন।

সন্ন্যাসী বললেন (হিন্দী ভাষায়)—এদিকে কোথায় চলেছেন ?

তিনি বললেন—হিমালয়ে উঠতে চাই। এখানে বহু মহাপুরুষ সাধু-সন্ন্যাসী আছেন....তাঁদের দর্শন বাসনা।

সন্ন্যাসী বললেন—তুমি ব্রাহ্মণ ? বাঙালী ?

দুর্গাচরণবাবু বললেন—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—সন্ধ্যাহ্নিক করো ? গায়ত্রী জপ করো ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ!

—দীক্ষা হয়েছে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—হিমালয়ে উঠে সাধু-সন্ন্যাসী দর্শনের উদ্দেশ্য ?

দুর্গাচরণবাবু বললেন—মুক্তি কামনা করি।

সন্ন্যাসী বললেন—তুমি সরকারী চাকরী করো, ঘর-সংসার আছে, চাকরিতে পদোন্নতির বাসনা মনে বেশ প্রখর....এদিকে আবার মুক্তির কামনা?

দুর্গাচরণবাবু বললেন—গৃহী মানুষ....গৃহীর কর্ত্তব্যানুরোধে চাকরি করি....পদোন্নতি কামনা করি। ঐহিক কর্ত্তব্য....তার উপর আমার নিজের পারলৌকিক মঙ্গল কামনাও করি।

সন্ন্যাসী বললেন—কিন্তু আর অগ্রসর হতে পারবে না। তার কারণ এর আগে বন আরো গহন...বাঘ আছে, হাতী আছে, সাপ আছে, ভাল্লুক আছে....গেলে তাদের কবলে পড়ে মৃত্যু নিশ্চিত। আমি তোমাকে নিষেধ করবো বলেই এখানে এসেছি।

দুর্গাচরণবাবু রোমাঞ্চিত। তিনি বললেন—কিন্তু আপনি কেমন করে জানলেন প্রভু যে আমি এদিকে আসছি এবং কি উদ্দেশ্যে আসছি?

সন্ন্যাসী বললেন—তোমরা গৃহী, তোমাদের যেমন কর্ত্তব্য আছে.... আমরা গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী, আমাদেরো তেমনি কর্ত্তব্য আছে। তা যাক ....এখন তোমার কোনো কামনা থাকে যদি, বলো।

দুর্গাচরণবাবু বললেন—দীক্ষা নিয়েছি....ইষ্ট মন্ত্র জপ করি....আমি চাই আমার ইষ্টদেবতার দর্শন।

সন্ন্যাসী বললেন—গায়ত্রী জপ করো....গায়ত্রীর অর্থ বোঝো?

দুর্গাচরণবাবু বললেন—না।

সন্ন্যাসী বললেন—তাহলে তো তোমার পূজা জপ সব নিষ্ফল! তোতাপাখীর মতো মন্ত্র আউড়ে গেলে তার ফল কি পাবে? কিচ্ছু না।

শোনো, আমি গায়ত্রীর অর্থ বুঝিয়ে দি।

সন্ন্যাসী গায়ত্রীর বিশদ ব্যাখ্যা বিবৃত করলেন....দুর্গাচরণবাবু একান্ত মনে তার মর্ম্ম উপলব্ধি করলেন। তার পর সন্ন্যাসী বললেন—বসে একশো আটবার গায়ত্রী জপ করো....তার পর তোমার ইষ্টদেবের ধ্যান করো...দর্শন পাবে।

দুর্গাচরণবাবু তাঁর কথামতো তাই করলেন। তার পর চোখ বুজে ইষ্টদেবের ধ্যান।

সন্ন্যাসী বললেন—চোখ খুলে সামনে ছাখো।

চোখ মেলে দুর্গাচরণবাবু দেখলেন তাঁর ধ্যানের দেবতার উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি!

চকিতের জন্ম দর্শন....তার পর সে-জ্যোতি মিলিয়ে গেল।

দুর্গাচরণবাবু তখন সন্ন্যাসীর পায়ে ধরে মিনতি জানালেন—আমাকে শ্রীচরণে স্থান দিন প্রভু....আমি আর ফিরবো না....আপনার চরণ-সেবা করবো।

সন্ন্যাসী বললেন—তা হয় না। তুমি গৃহী....তোমার কর্ত্তব্য, গৃহে সংসারে সমাজে। ফিরে যাও।

দুর্গাচরণবাবু বললেন—আর কখনো আপনার দশন পাবো না?

সন্ন্যাসী বললেন—পাবে। এক বছর পরে কুম্ভমেলা....প্রয়াগে....তোমাকে আসতে হবে....আমি প্রত্যক্ষ তা দেখছি....সেখানে দর্শন পাবে।

এবং এ-কথা সত্য হয়েছিল....সে-কাহিনী বলি।

দুর্গাচরণবাবু বলেছেন—পরের বছর প্রয়াগে কুম্ভমেলা....তিনি তখন

শোন নদীর ওধারে ডিউটি করছেন....হঠাৎ তাঁর এক দৌহিত্রের হলো মৃত্যু! তিনি শোকে কাতর....তখন তাঁর পত্নী এবং পিসিমা প্রভৃতি বললেন—চলো, প্রয়াগে কুম্ভমেলায়। তিনি রাজী হলেন এবং দশ-বারো দিনের ছুটী নিয়ে দুর্গাচরণবাবু চললেন তাঁর স্ত্রী, পিসিমা প্রভৃতি কজন পরিজনকে নিয়ে প্রয়াগে কুম্ভমেলায় স্নান করতে।

১লা মাঘ যোগের স্নান....যে-ঘাটে সাধুরা স্নান করেন, সেইখানে সে-তারিখে গিয়ে দাঁড়ালেন....সাধুদর্শন হবে। কুম্ভমেলায় প্রয়াগে প্রায় বিশ-পঁচিশ-ত্রিশ হাজার সাধু-সন্ন্যাসীর সমাবেশ হতো। এঁদের কোথায় বাস, কে জানে....কোথা থেকে এঁরা আসেন, কে জানে.... মেলাস্নানে ঠিক প্রয়াগে হয় এঁদের বিপুল সংখ্যায় সমাবেশ। সাধুরা যে-পথে স্নানে যাবেন, সে-পথের বেড়ার ধারে দর্শকদের জন্য স্থান থাকতো নির্দ্দিষ্ট। তখন ইংরেজের দিনে দেশের নেতার দল ইংরেজকে দিয়ে এ-সম্বন্ধে যে-বন্দোবস্ত কায়েমি করেছিলেন, তাতে দুর্য্যোগ বড় একটা ঘটতো না—কিন্তু একালে? আঙুল-ফুলে-কলাগাছ নেতারা দেখেন নিজেদের সুখ, নিজেদের স্বাচ্ছন্দ্য....অগণিত সাধু-সন্ন্যাসী এবং তাঁদের চেয়ে সংখ্যায় অনেক-অনেক বেশী জনসাধারণ....গরীব এবং মধ্যবিত্ত যাত্রীদের এঁরা মানুষ বলে গণ্য করেন না....তা এঁদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেখবেন কি! তা যদি দেখতেন, তাহলে সেদিন প্রয়াগ-মেলায় অমন যাত্রী-নিধন যজ্ঞ হতো না। কিন্তু সে-কথা যাক।

সাধু-সন্ন্যাসীরা প্রয়াগে এসে থাকতেন গঙ্গার ওপারে বিস্তীর্ণ চড়ায় উপর ছাউনিতে। সহরের লোকজনের না কোনো অসুবিধা ঘটে, সেদিকে ছিল তখনকার কর্ত্তৃপক্ষের লক্ষ্য।

সেবারে দুর্গাচরণবাবু বলেন—প্রয়াগে প্রায় দু লক্ষ সাধু-সন্ন্যাসীর সমাগম হয়েছে। ছাউনি থেকে এপারে এসে স্নান করবেন····সেজন্য তাঁদের সুবিধাকল্লে বাঁশের মজবুত পুল তৈরী হয়েছে।

বহুক্ষণ অপেক্ষা করেও যখন সকলে দেখলেন, সাধু-সন্ন্যাসীরা আসছেন না, তখন সকলে চিন্তিত হলেন। প্রশ্ন করে জানলেন, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ—নাগা সন্ন্যাসী এবং সন্ন্যাসিনীরা সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় পথে চলতে পারবেন না····আচ্ছাদনী-বস্ত্রে তাঁরা পথ চলবেন। এ-আদেশ নাগা সন্ন্যাসী এবং সন্ন্যাসিনীরা মানতে রাজী হলেন না···· এ-আদেশ তাঁরা মানবেন না এবং এবারের মেলায় তাঁরা স্নান করবেন না। তখন সাধু-সন্ন্যাসীদের পরিচর্য্যার সুবিধাকল্লে যে-ঠিকাদার নিযুক্ত ছিলেন····রাসবিহারী শেঠ, বেশ সম্ভ্রান্ত ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু····তিনি তখন ঘোড়ায় চড়ে ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছ থেকে ও-আদেশ নাকচ করিয়ে সাধু-সন্ন্যাসীদের সে-খবর জানালেন এবং সসম্ভ্রমে তাঁদের স্নানের জন্য আসবার আবেদন জানালেন। তখন দলে দলে নাগা সন্ন্যাসী এবং সন্ন্যাসিনীরা সম্পূর্ণ উলঙ্গ-অবস্থায় সে-পথ দিয়ে ঘাটে আসতে লাগলেন। তাঁদের পথে তাঁদের সামনে সাধারণ কোনো মূর্ত্তি না আসে, সেজন্য ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ পুলিশ (ইংরেজ) এবং বহু অফিসার তাঁদের গাইড হয়ে চললেন। নাগা সন্ন্যাসী এবং সন্ন্যাসিনীরা চলার পথে বলতে বলতে চলেছেন—যে-অঙ্গ তোমরা বস্ত্রাবরণে আচ্ছাদিত করে রাখো, যে-অঙ্গকে তোমরা জানো শুধু সম্ভোগের যন্ত্রস্বরূপ····সেভাবে আমরা সে-অঙ্গ দেখি না। পুরুষাঙ্গ আমরা দেখি নেতি ধৌতির জন্য পিচকারী স্বরূপ····স্ত্রী-অঙ্গ লজ্জার বস্তু নয়—স্ত্রী-অঙ্গ হলো মানুষের

মাতৃস্থানীয়া ব্রহ্মযোনি....পূজার শ্রদ্ধার সামগ্রী !

নাগা সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীদের পর সাধারণ সাধু-সন্ন্যাসী এবং সন্ন্যাসিনীদের দল চলেছেন....তাঁদের পরে চলেছেন নানক পন্থী বা নানক পান্থী সাধুর দল। এঁদের জাঁকজমক কিছু বেশী। এঁদের পরে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সাধুর দল চলেছেন....এঁদেরই সংখ্যা প্রায় লক্ষাধিক। এ-সম্প্রদায়ের সাধু-সন্ন্যাসীরা তুরী-ভেরী বাজিয়ে চলেছেন।

স্নানান্তে তাঁরা আবার এই পথেই ফিরলেন, তাঁরা চলে গেলে তাঁদের চলা-পথে ভক্তের দল গড়াগড়ি দিয়ে তাঁদের পদরজ পেয়ে কৃতার্থ হলেন। বেলা তখন চারটে বেজে গেছে।

দুর্গাচরণবাবু লিখেছেন—তারপর তাঁরা স্নান-দান করে বাসায় আহারাদি সেরে সাধু-দর্শনে বেরুলেন। গঙ্গার উপর বাঁশের সেই পুল পার হয়ে তাঁরা এলেন চড়ায় ছাউনির সামনে। প্রথমেই যে-আশ্রমে এলেন, এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা....তাঁর সামনে বহু ব্যক্তি....তিনি বসে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করছেন। তাঁর পাশে আরো বহু সাধু-সন্ন্যাসী.... সকলের সামনেই সাধারণ যাত্রীর ভিড়....তাঁরাও করচেন শাস্ত্রাদিপাঠ। সেখান থেকে বেরিয়ে বহু সাধুর আশ্রমে বহু সাধু দর্শন করে তাঁরা এলেন চড়ার উপর এক শিবমন্দিরের সামনে....মন্দিরের সামনে বহু সাধু বসে ধুনি জ্বালিয়ে হোম-জপাদি করছেন। সেখান থেকে এগিয়ে আরো দু-তিনটি ছাউনি অতিক্রম করার পর দুর্গাচরণবাবু দেখলেন, একজন সন্ন্যাসী সমাধি-মগ্ন। তাঁকে দেখে মনে হলো, এঁকে যেন পূর্ব্বে কোথায় দেখেছেন। মনে পড়লো, সেই কনখলের ধারে পাহাড়ে দেখা সন্ন্যাসী।

তিনি সেখানে বসে রইলেন ভক্তিভরে কৃতাঞ্জলিপুটে। প্রায় দশ

মিনিট পরে সন্ন্যাসীর সমাধি ভঙ্গ হলো। চোখ মেলে চেয়ে দুর্গাচরণ-বাবুকে দেখলেন....দেখে বললেন—দেখা হবে বলেছিলুম কুম্ভমেলায়.... হলো তো ?

দুর্গাচরণবাবু স্তম্ভিত। সন্ন্যাসীব বলেন—তুমি আমার দর্শন কামনা করেছিলে....তাই তোমাকে আমিই আমার চিত্ত সত্য বলে এখানে এনেছি।

দুর্গাচরণবাবু সপরিবারে তাঁর পায়ে প্রণত হলেন—তার পর নানা কথা। সন্ন্যাসী তাঁদের আশীর্ব্বাদ করলেন এবং নানা আলোচনার মধ্যে ভারতের তদানীন্তন সমাজনীতির এবং রাজনীতির কথা যা যা বলেছিলেন, শুনে দুর্গাচরণবাবু সন্ন্যাসীর সর্ব্বজ্ঞতা সম্বন্ধে অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন।

সন্ন্যাসী বলেছিলেন—আমাদের দেশের তন্ত্রমন্ত্র আজ কতকগুলো স্বার্থান্বেষী অনাচারীর হাতে পড়ে বুজরুকিতে দাঁড়িয়েছে। দেশের যাঁরা সুসন্তান, তাদের কর্ত্তব্য এ-শাস্ত্রের নিগূঢ় মর্ম্ম বুঝে চলা....তা চলতে পারলে ভারতের এবং জাতির দুঃখের অবসান হবে। সাধু বলেছিলেন— বিশ্বাস হলো তো তন্ত্রের শক্তিতে ? আমি তোমাকে এখানে এনেছি এবং এক বছর পূর্ব্বে বলেছিলুম, আবার দেখা হবে এবং দেখা হবে প্রয়াগে। এ-কথা বলেছিলুম, তার কারণ তান্ত্রিকের চোখে ভবিষ্যৎ অদৃশ্য থাকে না।

আট

ভবিষ্যৎ কথা

একটা ব্যাপার আমরা লক্ষ্য করে আসছি—পরলোকতত্ত্বে বা অলৌকিক ব্যাপারে যাঁদের অনুরাগ এবং শ্রদ্ধা, জীবনে এ-সব বিষয়ে তাঁরা এ-সম্বন্ধে অনেক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেন।

রায় সাহেব দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের এ-ব্যাপারে ছিল গভীর নিষ্ঠা....তাঁর জীবনের আর একটি অদ্ভুত কাহিনী সঙ্কলিত করে দিচ্ছি!

তিনি এ-বৃত্তান্ত লিখে গিয়েছেন....বৃত্তান্তের মর্ম্ম :—

তিনি লিখেছেন—১৮৮২ সালের কথা। তিনি তখন থার্ড গ্রেড এঞ্জিনীয়ার....সেকণ্ড গ্রেডে প্রোমোশনের জন্য পরীক্ষা দিয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন, তবু তাঁর প্রোমোশন হচ্ছে না। তিনি গভর্ণমেণ্টকে লিখেছেন—তাঁর ন্যায্য প্রোমোশন যদি অবিলম্বে না দেওয়া হয়, তাহলে তিনি রেলোয়ে সার্ভেতে জয়েন করবেন। এ-পত্রের কোনো জবাব আসেনি....এমন সময় বদলি হয়ে তিনি গেলেন সাসারণ জেলায় মতিহারীতে এ্যাসিষ্টাণ্ট এঞ্জিনীয়ার পদে বদলি হয়ে। সেখানে 'টিয়র' কেনালে জল চলে না....সেই কেনালের সংস্কার কাজ করতে হবে।

তিনি সেখানে গিয়ে কাজ করছিলেন এবং গ্রামে গ্রামে যাতে প্রচুর জল সরবরাহ হয়, তার ব্যবস্থা করেছেন। একদিন সকালে বেরুবেন....একভেরি গ্রামে জল সকলে পাচ্ছে কি না সন্ধান করতে....হঠাৎ তাঁর বাঙলোয় এক সাধুর আবির্ভাব। তিনি প্রশ্ন করলেন—কি চাই?

সাধু বললেন—কাছে এক গ্রামে এক বিন্দু জল নেই....চাষ-বাস বন্ধ....লোকে জলাভাবে মরতে বসেছে।

দুর্গাচরণবাবু তখনি সন্ধানে বেরুবেন, বললেন। তার পর সাধুর সঙ্গে নানা কথা। সাধু তন্ত্র-মন্ত্র সিদ্ধ....দুর্গাচরণবাবু বললেন—জ্যোতিষের চর্চ্চা করেন ?

সাধু বললেন—খুবই সামান্য জানি।

দুর্গাচরণবাবু বললেন—আচ্ছা বলুন তো, আমার পদোন্নতির সব ব্যবস্থা পাকা....তবু তা হচ্ছে না। এ-চাকরি ছেড়ে দেবো ভাবছি। এ-চাকরিতে পদোন্নতির আশা আছে ?

সাধু তাঁর দিকে চেয়ে বললেন—নিশ্চয় পদোন্নতি হবে।

—কবে ?

সাধু বললেন—আজ থেকে চৌদ্দ দিনের মধ্যে।

তার পর সাধুর কথায় তিনি চললেন তাঁর গ্রামে জলের ব্যবস্থা যাতে হয়, তার আয়োজনাদি করতে।

গিয়ে যথারীতি ব্যবস্থা করে তিনি ফিরে এলেন তাঁর বাঙলোয়। এ-ঘটনার দু হপ্তা পরে তাঁর উপর নির্দ্দেশ এলো—'টিয়র' কেনালের জল আশপাশের কত একর জমিতে পাওয়া যাচ্ছে, তার রিপোর্ট দেবার জন্য।

দুর্গাচরণবাবু আবার বেরুলেন পাশাপাশি গ্রামগুলি পরিদর্শন করতে এবং এ-ব্যাপারের কদিন বাদে তিনি এলেন সেই সাধুর গ্রামে। সাধুর সঙ্গে দেখা হলো....সাধু তাঁকে অভ্যর্থনা করে একটু গুড়, ছোলা আর জল দিলেন খেতে। দুর্গাচরণবাবু বললেন—আপনি মিথ্যা স্তোক দিয়েছিলেন আমাকে !

সাধু বললেন—কি মিথ্যা স্তোক ?

দুর্গাচরণবাবু বললেন—বলেছিলেন, দু হপ্তার মধ্যে আমার প্রোমোশন হবে....তার কিছু হলো না তো !

সাধু বললেন—সে কি ! এমন হতে পারে না। নিশ্চয় আপনার প্রোমোশনের হুকুম হয়েছে। আপনি সে-হুকুম পাননি ?

—না।

সাধু বললেন—আপনি বাঙলোয় ফিরে গিয়ে পাবেন সে হুকুম। আমি যা বলেছিলুম, পনেরো দিনের মধ্যেই আপনার প্রোমোশনের হুকুম বেরিয়েছে....আপনি এখনো সে-হুকুম পাননি।

যাই হোক, গ্রামাঞ্চল পরিদর্শন করে দুর্গাচরণবাবু ফিরলেন একভেরির বাঙলোয় প্রায় এক মাস পরে....ফিরে এসে ডাকের চিঠিপত্রের মধ্যে দেখলেন, তাঁর প্রোমোশনের হুকুম এসে গেছে এবং সে-হুকুমের তারিখ....সাধু বর্ণিত সেই পনেরো দিনের মধ্যেই সহি হয়েছে ..হুকুম তাঁর কাছে আসতে এত বিলম্ব।

নয়

পিল্লি

সিংহল দ্বীপের কাহিনী....এ-কাহিনীতে বৈচিত্র্য আছে।

কাহিনীটি বলবার পূর্ব্বে একটু ভূমিকার প্রয়োজন।

আমাদের দেশে যেমন তন্ত্র-মন্ত্র করা মাদুলির প্রচলন আছে....কোনো মাদুলি ধারণ করলে অশুভ-অমঙ্গল কাটে, কোনো মাদুলি গ্রহণে রোগ সারে, কোনো মাদুলি গ্রহণে চাকরি মেলে, কোনো মাদুলি গ্রহণে যেমন যাকে ইচ্ছা—স্ত্রী-পুরুষকে সম্পূর্ণ বশে আনা যায়—সিংহলে তেমনি এক শ্রেণীর গুণী ওস্তাদ আছে....তারা তান্ত্রিক মতে সাধনা করে শবকে জীবন্ত করে তুলতে পারে। তাদের এ-বিদ্যার নাম 'পিল্লি'....এই পিল্লির জোরে অসাধ্য সাধন করা যায়। মানুষের শব শুধু নয়...প্যাঁচা, চিল, পোকা-মাকড়ের মৃতদেহ নিয়েও এই পিল্লির ক্রিয়া চলে। মৃতদেহ সজীব হলে গুণী ওস্তাদ তাকে যে-আদেশ করবে, সে তাই করবে। চিল, প্যাঁচাদের মৃতদেহ পিল্লি-প্রণালীতে সজীব হলে তারা গুণীর নির্দ্দিষ্ট মানুষকে বা জীবন্ত কোনো প্রাণীকে ঠুকরে কামড়ে তার মহা অনিষ্ট সাধন করে। মানুষের মৃতদেহকে এ-মন্ত্রে সঞ্জীবিত করে তার হাতে অস্ত্র দাও....দিয়ে বলো, অমুকের শির চাই....ব্যাস, সে-শব তখনি সে-অস্ত্র নিয়ে শত্রু নিপাত করে আসবে। সে-শত্রু এক হাজার মাইল দূরে যদি থাকে....তবু তার নিস্তার নেই।

এখন বলি সে-কাহিনী :—

সিংহলের এক বড় জমিদার....ওখানে জমিদাররা 'রাজা'-পদবীতে ভূষিত....জমিদারের তহশীলদার বছরে দুবার বেরোন লোকজন নিয়ে ধূমধামে রাইয়ৎ প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করতে। রাজার লোক....প্রতিনিধি....তার উপর টাকা-পয়সার ব্যাপার—তহশীলদারের খাতির ঠিক রাজার মতো।

এক রাজার তহশীলদার ধূমধামে রাজার যে-সব জমি সাগরের ধারের মহল্লায়...সেখানে এসে হাজির খাজনা আদায় করতে। তাঁর অভ্যর্থনার জন্য তাঁর পথের ধারে যত বাড়ী সজ্জাভূষণে বিভূষিত....ফুলের মালা টাঙানো....মাতব্বরের দল মিছিল করে তহশীলদারকে নিয়ে চলেছেন রাজার কাছারি বাড়ীতে। মিছিল দেখতে পথে, যত বাড়ীর ছাদে, বারান্দায় কাতারে কাতারে লোক জমেছে।

এক ধনী সদাগরের বাড়ীর ছাদে সদাগরের রূপসী স্ত্রী উঠেছেন.... সঙ্গে দুজন দাসী....তাঁরা দেখছেন মিছিল। সদাগরের রূপসী স্ত্রীকে তহশীলদার দেখলেন....দেখে তাঁর হলো ঝোঁক, ঐ রূপসীকে চাই।

কাছারি বাড়ীতে পৌঁছে তিনি লোক পাঠালেন সদাগরের বাড়ী ....সদাগরের স্ত্রীর নেমন্তন্ন তাঁর ঘরে। দূত এসে এ-খবর দিতে সদাগরের স্ত্রী রেগে আগুন। তিনি বললেন—আস্পর্দ্ধা কম নয়! আমার বিবাহ হয়েছে...আমার স্বামী বেঁচে....আমাকে ডাকেন ওঁর ঘরে, যাবো ওঁকে খাতির করতে! স্বামী যদি বাড়ী থাকতেন, তাহলে তাঁকে দিয়ে এ-আস্পর্দ্ধার শোধ নেওয়াতুম।

দূত এসে এ-খবর জানালো তহশীলদারকে। তহশীলদার ক্ষেপে উঠলেন....তিনি বললেন—পাকড়ে আনো মেয়েটাকে।

লোকজন বললে—এমন কাজ করবেন না। সদাগর পরম ধার্ম্মিক মানুষ....সকলে তাঁকে দেবতার মতো মান্য করে....এখানে তাঁর অতুল প্রতিপত্তি....তাঁর বাড়ীতে অত্যাচার করতে গেলে মহল্লার লোক ক্ষেপে উঠবে....তখন প্রাণ বাঁচানো দায় হবে।

বটে! তাহলে?

পিল্লির কথা মনে পড়লো....তহশীলদার হুকুম দিলেন—বোলাও গুণী ওস্তাদ।

গুণী ওস্তাদ এলো....তহশীলদারের ডাক! তহশীলদার তাকে বললেন—ঐ সদাগর এখন সাগরপারে রামেশ্বরে....কারবারের কাজে গিয়েছে। তুমি মন্ত্র পড়ে ভূত চালাও....সেখানে গিয়ে সদাগরের মাথা নেবে। সদাগর মারা গেলে তখন তার ঐ বৌকে আমি করবো বিয়ে।

ওস্তাদের হাতে মোটা টাকা দেওয়া হলো। ওস্তাদ তখন একটা কবর থেকে মানুষের মৃতদেহ তুলে পিল্লি-প্রণালীতে তাকে সজীব খাড়া করে তুললো....তুলে তার হাতে দিলো তলোয়ার। দিয়ে তহশীলদারের হুকুমে তাকে নির্দ্দেশ দেওয়া হলো, রামেশ্বরে আছে সদাগর....ঐ তলোয়ারের চোটে তার শির নিতে হবে।

তলোয়ার নিয়ে ভূত চললো বাতাসে উড়ে।

ওখানে এমন বরাত জোর—সদাগর তখন তাঁর দুজন অনুগত অনুচর নিয়ে মন্দিরে পূজার্চ্চনা করছেন! ভূত এসে দেখলো—মন্দিরে তার প্রবেশ-অধিকার নেই....অথচ এমন বিধি যে, ভূত যদি এসে কাজ হাসিল করতে না পারে, তাহলে তিলেক কাল অপেক্ষা করবে না.... সে তখনি ফিরবে এবং ফিরে যে হুকুম দিয়ে পাঠিয়েছে....তার উপর

এ-আদেশ পালন না করে ছাড়বে না। এক্ষেত্রেও তাই হলো। ভূত ফিরলো সিংহলে তহশীলদারের কাছারি বাড়ীতে—সেখানে গুণী ওস্তাদ এবং তহশীলদার অপেক্ষা করছেন অভীষ্টসিদ্ধির খবর আসবে। ভূত এলো এবং তার হাতের সেই তলোয়ারের চোট পড়লো তহশীলদার এবং সেই গুণী ওস্তাদের ঘাড়ে....দুজনের মাথা গেল।

এই পিল্লি-ব্যাপার এখনো এ-যুগে সিংহলে প্রচলিত আছে। তবে গুণী ওস্তাদের সংখ্যা কমে আসছে।

এই পিল্লির প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ছে। আমাদের দেশে 'ভূত চালা', 'বাণ মারা' এমনি ব্যাপার চলিত ছিল....এখনো নেই, এমন বলা চলে না। 'ভূত চালা' কখনো দেখিনি....তবে 'বাণ মারা' দুবার দেখেছি।

এমন একটি কাহিনীর কথা বলে এ-প্রসঙ্গ শেষ করি।

২৪ পরগণা জেলার এক গ্রাম....কলকাতা থেকে বিশ-বাইশ মাইলের মধ্যে এ-গ্রাম। নাম ধরা যাক ভবনাথ আর সীতানাথ দুই জ্ঞাতি। দুজনে পূর্ব্বপুরুষের দিক থেকে এজমালি বহু জমির মালিক.... জমি নিয়ে দু পক্ষে হলো বিরোধ, বিবাদ এবং মকর্দ্দমা। সীতানাথ অতিলোভী....তার অর্থবল ভবনাথের চেয়ে বেশী। ভবনাথকে সে দুমুঠো টাকা দিয়ে তাঁর অংশের জমি চায় আত্মসাৎ করতে....ভবনাথ তাতে রাজী নয়। মামলা লড়লে সীতানাথের পরাজয় অনিবার্য্য! তখন সীতানাথ করলেন কি, কাছাকাছি গ্রামে ছিল এক ওস্তাদ গুণী.... তান্ত্রিক....ভূত-প্রেত নিয়ে তার কারবার। তাকে টাকা দিয়ে ঐ 'বাণ মারা' প্রক্রিয়া করলো....ফলে অদৃশ্য বায়ুবাণের আঘাতে ভবনাথ মুখে

রক্ত উঠে মারা গেল। তখন ভবনাথের নাবালক পুত্র কৃপানাথ ভবনাথের অংশের মালিক। তাকে কিছু টাকা দিয়ে সীতানাথের প্রয়াস জমি হস্তগত করবে....কিন্তু কৃপানাথও রাজী হলো না। তখন কৃপানাথকেও ঐ গুণীর 'বাণ মারা' মন্ত্রে ইহলোক থেকে সরানো হলো। কৃপানাথের বিধবা স্ত্রী পড়লেন অকূল পাথারে....তাঁর দু-তিনটি নাবালক ছেলে—ওদিকে বিপক্ষ হলো প্রতিপত্তিশালী ধনী সীতানাথ।

কলকাতায় থাকেন এক তান্ত্রিক পণ্ডিত....তিনি খুব সজ্জন....টাকার লোভে কখনো কারো অনিষ্টকর কাজে হাত দেন না। তাঁর কথা শুনে কৃপানাথের বিধবা স্ত্রী কলকাতায় এসে পণ্ডিতজীর পায়ে কেঁদে পড়লেন ....তাঁকে বললেন বিপদের কথা। পণ্ডিতজী বিধবাকে বললেন—যে দুর্ব্বৃত্ত গুণী 'বাণ মেরে' এ-হত্যা সাধন করেছে....সে পঞ্চাশটি টাকা মূল্য নিয়ে এ-অপকর্ম্ম করেছে। তার নাম ধাম পর্য্যন্ত পণ্ডিতজী বললেন বিধবাকে এবং বিধবাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন—যাও মা, ভয় নেই.... আমি বিপরীত মন্ত্র সাধন করছি....তোমার কোনো অনিষ্ট তারা করতে পারবে না। যা হয়ে গেছে, তার চারা নেই। মৃতদের ফিরিয়ে আনতে পারবো না....তবে আর তোমাদের কোনো অনিষ্ট হবে না— সে-সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থেকো! তিনি আরো বলেছিলেন—এ-শক্তি লাভ করে যে-ব্যক্তি এমনপাপকার্য্য করে, তার বংশ থাকে না। এ-পাপের ফল তাকে ভোগ করতেই হবে। এবং শুনেছি, যে-লোকটা সীতানাথের টাকা খেয়ে এ-অপকর্ম্ম করেছিল, তার বংশে আজ কেউ নেই....সে-অপকর্ম্ম করবার পর এক বছরের] মধ্যেই তার ছেলে মেয়ে স্ত্রী মারা গিয়েছে।

দশ

তান্ত্রিক সুরেন্দ্রনাথ

আমার এক বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত আত্মীয়ের মুখে শোনা....তাঁর প্রত্যক্ষ করা কাহিনী।

আত্মীয়টি দীর্ঘকাল হাওড়ায় ব্যাঁটরার কাছাকাছি থাকতেন বাল্যাবধি। তখন পাড়ায় থাকতেন সুরেন্দ্রনাথ....সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে মহল্লার সব পরিবারের সঙ্গে বেশ অন্তরঙ্গতা ছিল। সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন তন্ত্রাদিতে গুণী ওস্তাদ। বাণ মারা, নল চালায় ছিল তাঁর বিশেষ পারদর্শিতা....তার উপর ভূত ছাড়ানো এবং আরো বহু তান্ত্রিক-ক্রিয়াও তিনি করতেন....প্রয়োজন মতো। এ ছাড়া কৌতুক করেও বহু ক্রিয়া-কাণ্ড করতেন....পরিচিতজনের অনুরোধে।

ব্যাঁটরায় আমার এই আত্মীয়ের পরিচিত এক বাড়ীতে একদিন গহনা চুরি যায়....দু-তিনশো টাকা দামের সোনার গহনা। যে-বাড়ীতে চুরি....সে-বাড়ীর বাগানে পুকুর....এবং এ-পুকুরের জল পরিষ্কার বলে পাড়ার বহু পরিবারের মেয়েরা এ-পুকুর থেকে পানীয় জল নিয়ে যেতেন নিত্য-নিয়মিত। পাড়ার যে-সব মেয়ে জল নিতে পুকুরে আসতেন, তাঁরা বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে বসে গল্পগুজব করতেন....অর্থাৎ ঐ জল নেওয়া নিয়ে পরস্পরে বেশ হৃদ্যতা ছিল....সকলেই যেন এক পরিবারভুক্ত।

যেদিন গহনা চুরি যায়, সেদিন বাড়ীর এক বধূ নিমন্ত্রণে গিয়েছিলেন ....দিনের বেলায়। ফিরে এলে পাড়ার কজন মেয়ে এ-বাড়ীতে ছিল,

তাঁদের কাছে সবিস্তারে নিমন্ত্রণ-বাড়ীর বর্ণনা দেন এবং বহুক্ষণ গল্পগুজব হয়। বধূটি গল্পস্বল্পের মধ্যে গহনা খুলে আলমারি খুলে আলমারির ড্রয়ারে রাখেন....তার পর রাত্রে বধূর শাশুড়ী সংসারের কাজ সেরে সিন্দুকে তুলে রাখবেন!

রাত্রে গহনা সিন্দুকে তোলবার সময় দেখা গেল, আলমারির কল ভাঙা....চাবি লাগে না—ড্রয়ার টেনে খুলতে দেখা গেল, গহনা নেই। গহনাটি ছিল 'তোলা'-হার। সোনার হার।

পুলিশে খবর দেওয়া হলো। পুলিশ এসে সব কথা শুনে বললে—যে-মেয়েরা ও-ঘরে বসে গল্প করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কেউ সরিয়েছেন নিশ্চয়....সুযোগ বুঝে। সর্ব্বনাশ! ভদ্রঘরের মেয়ে তাঁরা....কাকে সন্দেহ করবেন? তখন নল চালার ব্যবস্থা হলো।

সুরেন্দ্রনাথ ও-বিদ্যায় ওস্তাদ। তাঁকে ডাকা হলো। তিনি মন্ত্র পড়ে নল চালালেন—এ-নলচালার সময় পাড়ার বহু লোক ছিলেন উপস্থিত....আমার এই আত্মীয়ও ছিলেন উপস্থিত।

আমার আত্মীয় বলেন—তিনি দেখলেন, পাড়ার দুটি ছেলে দু বগলে দু গাছি বাঁশ....একজন ডগার দিকে, একজন অন্য প্রান্ত বগলে চেপে দাঁড়ালেন। সুরেন্দ্রনাথ মন্ত্র পড়ে সে-বাঁশে বা নলে দিলেন শক্তি....অমনি সেই বাঁশের শক্তিতে ছেলে দুটি চললো এ-বাড়ী ছেড়ে....পথ ধরে ....বাগান পার হয়ে সরু গলি দিয়ে। ছেলেরা বাঁশ বগলে নিয়ে ঢুকলো এক প্রতিবেশীর গৃহে—গৃহে ঢুকেই প্রাঙ্গণ....প্রাঙ্গণের কোণে রান্নাঘর—রান্নাঘরের দিকে চললো দুটি ছেলে ঐ বাঁশ বগলে চেপে। তাঁরা ঢুকলেন রান্নাঘরে। রান্নাঘরে বাড়ীর এক কন্যা....বিশ-বাইশ বছর বয়স....রান্না

নিয়ে ব্যস্ত....বাঁশ গিয়ে কণ্ঠ ধরলো চেপে। কি ভয়ানক চাপ! কন্যা চীৎকার করে উঠলো....স্বীকার করলো—সে নিয়ে এসেছে হার....সে-হার আছে ভাঁড়ারে জলের জালার মধ্যে।

সোনার হার পাওয়া গেল!

সুরেন্দ্রনাথের এ-ব্যাপার অনেকেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এই সুরেন্দ্রনাথের ভূত-ছাড়ানোর কাহিনী এবার বলি।

দশ-বারো বছর আগের কথা।

আমার আত্মীয়ের নদিদি....তিনি আসেন পিত্রালয়ে সন্তান প্রসব করতে। সন্তান প্রসবের পর পিত্রালয়েই তিনি আছেন। আঁতুড় থেকে বেরুলেন, ষষ্ঠীপূজা হলো....কিন্তু নানা পুষ্টিকর খাদ্য এবং সযত্ন সেবা-পরিচর্য্যা সত্ত্বেও নদিদির শরীর সারে না....দিনে দিনে তিনি দুর্ব্বল হতে লাগলেন এবং সেই সঙ্গে দেহে নানা উপসর্গ! চিকিৎসা চললো....কিন্তু চিকিৎসায় কোনো ফল হয় না। সকলে বেশ ভাবিত হলেন।

এমন সময় সহসা একদিন কি কারণে সুরেন্দ্রনাথ এলেন এ-বাড়ীতে ....এসে তিনি দেখলেন নদিদিকে। দেখে তিনি বললেন—এ কি চেহারা!

বাড়ীর সকলে বললেন—প্রসবের পর কিছুতে সারছে না....দিন দিন শরীর যা হচ্ছে....চিকিৎসায় কোনো ফল পাওয়া যাচ্ছে না।

সুরেন্দ্রনাথ বললেন—চিকিৎসায় কি করে ফল পাবে! এ তো ওকে ভূতে পেয়েছে, দেখছি।

ভূতে পেয়েছে! এ-কথা শুনে সকলে স্তম্ভিত! বাড়ীতে ভূতের উৎপাত নেই....ভূত আছে বলে কেউ কখনো একটা কথা বলেনি....

বলতে পারেনি…নদিদি কখনো বাড়ী থেকে বেরোন না—ভূতে পাবে কি করে? কোথায়?

সুরেন্দ্রনাথ তখন কি ফর্দ্দ দিলেন….দিয়ে বললেন—কাল এ-সব তৈরী রেখো….আমি এসে ব্যবস্থা করবো।

আমার আত্মীয় বললেন—সুরেন্দ্রনাথের নির্দ্দেশ মতো আয়োজন হলো….তিনি এলেন আমাদের বাড়ী….বেলা তখন নটা। পাড়ার বহু লোক জমেছিল বাড়ীতে। সুরেন্দ্রনাথ বসে ধূপধূনা জ্বাললেন….পূজার্চ্চনা করলেন….বড় একটা পাত্রে জল ঢাললেন….তার পর সে-জলে মন্ত্র পড়লেন। জলে মন্ত্র পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নদিদি তন্দ্রাবেশে ঢুলে পড়লেন। সুরেন্দ্রনাথ বললেন—ছাখো সকলে জলে….কিছু দেখতে পাও কি না।

সকলে দেখলেন….দেখলেন, জলে এক কঙ্কালসার বৃদ্ধার ছায়া। এ-বৃদ্ধাকে বহুকাল আগে সকলে দেখেছিলেন—এ-বাড়ীতে এসে ও-বাড়ীতে চাল-ডাল চেয়ে নিয়ে যেতো। বৃদ্ধাকে কেউ তিন-চার বছর আর ছাখেননি।

সুরেন্দ্রনাথ বললেন—মরে ভূত হয়ে এখনো পাড়ায় ঘোরে। এর ভর হয়েছে মেয়ের উপর!

—কি করে? কেন? প্রশ্ন হলো।

সুরেন্দ্রনাথ বললেন—এখনি সকলে শুনবেন।

তিনি সর্ষে এবং হলুদের গুঁড়ো নিলেন….নিয়ে আগুনে দিলেন মন্ত্র পড়ে….অমনি নদির তন্দ্রাভঙ্গ হলো। নদি বলে উঠলেন আর্ত্তকণ্ঠে—যাচ্ছি….যাচ্ছি….আর যাতনা দিয়ো না বাবা!

সুরেন্দ্রনাথ বললেন—কেন ভর করেছিস?

নদির কণ্ঠে জবাব শোনা গেল—লুচি খাবো, ঘী-দুধ খাবো ···সেই লোভে !

—কোথায় আছিস বুড়ী ?

নদির কণ্ঠে জবাব ফুটলো—দত্তদের বাগানে যে-জামগাছ, সেই জামগাছে। পাড়ায় ঘুরি····মায়া ছাড়তে পারি না কি না !

তার পর নানা প্রশ্নোত্তরের পর বুড়ীর ভূত বললে—ছেড়ে যাচ্ছি।

ছাড়ার নিশানা জানা গেল—সুরেন্দ্রনাথের কথায় নদি সদর পর্য্যন্ত চলে গেলেন····গিয়ে সদরে দুম্ করে পড়ে মূর্চ্ছা ! তার পর আর কোনো উৎপাত নেই····নদি তার পর সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন।

এগারো

ফকির সাহেব

Hindu Spiritual Magazine পত্রিকায় ১৯১৩ সালের ডিসেম্বর সংখ্যায় কাথিবাড় থেকে প্রেষ্টনজী জামশেটজী এই ঘটনার কথা লিখে প্রকাশ করেছিলেন।

নাগদেশ গ্রামে তাঁর পরিচিত এক কৃষকের একটি মাত্র পুত্র···· জোয়ান সুস্থ ছেলে···হঠাৎ তার এমন ফিট হতে লাগলো যে প্রাণসংশয় অবস্থা। কৃষকের পয়সাকড়ি আছে····একটিমাত্র ছেলের চিকিৎসায় তার কোনো কার্পণ্য নেই। গ্রামের ডাক্তার বৈদ্য ছেলের চিকিৎসা করলেন····জেলার সাহেব ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়ে ছেলেকে দেখালেন—এক বৎসর চিকিৎসা চললো····কিন্তু ছেলের রোগ আর সারে না। কৃষক এবং বাড়ীর সকলে অত্যন্ত উদ্বেগে বাস করে।

গ্রামে এক ফকির সাহেব এলেন····তাঁর সঙ্গে কৃষকের আলাপ। ফকিরকে মাঝে মাঝে সাধ্যমত আটা তরী-তরকারী দেয়···ফকির তাকে স্নেহ করেন। একদিন ফকির বললেন কৃষককে—তোমাকে সব সময়েই মনমরা দেখি! কেন বলো তো?

কৃষক তখন ফকিরকে বললে একমাত্র সন্তানের অসুখের কথা। বললে, প্রত্যহ রাত্রে ছেলের তিন-চার বার করে ফিট হয়····কী ভয়ানক ফিট····হাত পা ছোড়ে, মাটীতে আছাড় খেয়ে পড়ে···হাত পা কেটে, মাথা কেটে রক্তপাত! এত চিকিৎসা হচ্ছে····কিছু ফল

হচ্ছে না! ফকির বললেন—আমাকে নিয়ে যাবে তোমার বাড়ী? একবার আমি ছেলেকে দেখতে চাই।

সেইদিনই সন্ধ্যার সময় ফকিরকে কৃষক নিয়ে এলো তার গৃহে। সন্ধ্যার একটু পরেই বাড়ীর মধ্যে ছেলের ফিট....হাত পা খেঁচুনি, চীৎকার....তিন-চারজন জোয়ান মানুষ ছেলেকে চেপে সামলে রাখতে পারে না।

ফকিরকে আনা হলো। ছেলেকে দেখে ফকির বুঝলেন, ভূতে পাওয়া ব্যাপার! তিনি তাঁর তুকতাক সুরু করলেন....ধূপধূনা জ্বাললেন ....তার পর অগ্নিকুণ্ডে ফেললেন মন্ত্রপড়া কি কতকগুলো গুঁড়ো। যেমন গুঁড়ো ফেলা, রোগী চীৎকার করে উঠলো—আমি যাবো না, যাবো না....কিছুতে যাবো না। কেন ও আমার থাকবার জায়গা নোংরা করেছিল?

প্রশ্ন: কোথায় তোমার জায়গা? কবে নোংরা করলো?

ছেলে বললে—বাড়ীর পিছনে কুলগাছ....সেই গাছে আমি থাকি। একদিন....অনেকদিন আগে....সেদিন বৃহস্পতিবার...সন্ধ্যার সময় আমি তখন গাছে...ও আমার গাছের তলা নোংরা করেছিল! আমি ছাড়বো না....রোজ রোজ জ্বালাতন করবো....ওকে না মেরে আমি যাবো না।

ফকির বললেন—তুমি গাছে আছো....ও জানবে কি করে? না জেনে নোংরা করেছে। তার জন্য যথেষ্ট সাজা দিয়েছো....এখন ছাড়ো।

—না না না! ছেলের কণ্ঠে জোর গলার প্রতিবাদ। ছেলে বললে

—না, যাবো না····কিছুতে যাবো না।

ফকির বললেন—বেশ····কেমন না যাও, দেখি।

তখন তিনি আবার মন্ত্র পড়ে কতকগুলো গুঁড়ো ফেললেন আগুনে ····সঙ্গে সঙ্গে ছেলের কণ্ঠে আর্ত্তনাদ—উঃ····জ্বলে গেলুম····পুড়ে গেলুম।

ফকির বললেন—পুড়িয়ে তোমাকে কী করি, ত্যাখো। এখনো বলো, ছাড়বে ?

—ছাড়বো····ছাড়বো····এখনি ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছি।

—আর কখনো এদিক মাড়াবে ?

—না ···না····না।

এ-কথার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি অজ্ঞান হয়ে পড়লো। তার পর যখন জ্ঞান হলো, তখন আর কোনো উপসর্গ নেই এবং তার পর ছেলের এ-রোগ থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি !

বারো

ছায়াময়ী

এ-কাহিনীটি Hindu Spiritual Magazine পত্রিকা থেকে সঙ্কলিত। দ্বারভাঙ্গা জেলার কথা....প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেকার ঘটনা। মদনগোপালের বয়স আঠারো-উনিশ বছর....গৌরকান্তি সুপুরুষ যুবা (মদন তার আসল নাম নয়....ছদ্মনাম)। দ্বারভাঙ্গা জেলার এক গ্রামে সে ছিল বিদ্যার্থী....সেখানকার পণ্ডিতের টোলে সংস্কৃত অধ্যয়ন করতো। ভূমিহার ব্রাহ্মণ জমিদার....তাঁর গৃহে মদন বাস করতো.... জমিদার বাড়াতে তার আদর-যত্ন ছিল।

মদন ছিল খুব সদাচারী এবং নৈষ্ঠিক....খুব অধ্যয়নশীল।

একদিন রাত একটা পর্য্যন্ত জেগে মদন লেখাপড়া করে তার পর শয্যাশ্রয়ী হলো ঘুমোবার জন্য। ঘরের জানলা খোলা....আলো নিবুনো.... জ্যোৎস্না রাত্রি....জানলা দিয়ে ঘরে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে। ঘরের দরজাও খোলা....দরজা দিয়ে জ্যোৎস্না এসে ঘরে পড়েছে। মদন বিছানায় শোবামাত্র ঘুমিয়ে পড়লো।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছে, জানে না....হঠাৎ ঘরে শয্যাপার্শ্বে কার সান্নিধ্য উপলব্ধি....সঙ্গে সঙ্গে তার ঘুম গেল ভেঙ্গে। চোখ মেলে চেয়ে দেখে, তার বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে সুবেশা সুরূপা এক কিশোরী। মদন ভাবলো, স্বপ্ন! কিন্তু পরক্ষণেই বুঝলো, স্বপ্ন নয়....সত্যই এক কিশোরী-মূর্ত্তি! ভাবলো, মাথা খারাপ না কি? এত রাত্রে তার ঘরে আসে

কিশোরী! সে উঠে বসলো....তাকে বললে—যাও....এ-ঘরে কেন?

কিশোরীর মুখে কথা নেই....দু চোখের দৃষ্টিতে করুণ মিনতি....যেন সাধছে—যেতে বলো না!

আরো কবার মদন তাকে চলে যেতে বললে....সে গেল না। তখন রাগে মদন তাকে দিলে ঠ্যালা....কিশোরীর দেহের তপ্ত স্পর্শ পেলে....কিশোরী নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। মদন তখন ঘরের দরজায় খিল এঁটে বিছানায় এসে শুয়ে পড়লো। শোবামাত্র ঘুম।

ঘুম তখনি ভেঙ্গে গেল....ঘরে পায়ের শব্দ। চেয়ে দেখে, সেই কিশোরী! এবারে ভালো করে দেখলে....বুঝলো, শরীরিণী নয়....বিদেহিনী ছায়ামূর্ত্তি।

মদনের ভয় হলো....ভয়ে সে বিছানার চাদর টেনে মুখ চাপা দিলে। পরক্ষণে তার খাটিয়ায় যেন কে বসলো....মদন স্পষ্ট তা উপলব্ধি করলো। গায়ে পেলো মদন করস্পর্শ...সেই সঙ্গে শুনলো কথা—আমাকে যেতে বলো না....তোমাকে দেখে আমি বড় আনন্দ পাই....তোমাকে আমার ভারী ভালো লাগে! আমার দিকে চেয়ে ছাখো।

সঙ্গে সঙ্গে দেশলাই জ্বালার শব্দ....মদন উঠে বসলো....দেখলো, ঘরে ল্যাম্প জেলেছে কিশোরী। ভয়ে তার বুক দুদ্দুড় করছে....কণ্ঠতালু শুকিয়ে কাঠ!

কিশোরী বললে—আমি এ-বাড়ীর মেয়ে ছিলুম....ষোল বছর বয়সে মৃত্যু....মৃত্যু হয়েছে ছ মাস আগে। তুমি তখনো এখানে আসোনি। বাড়ীতে আছি সেই থেকে। একা-একা....বাড়ী যেন খাঁ খাঁ করছিল....কিছু ভালো লাগতো না....শুধু ঘুরে বেড়াতুম....তুমি এ-বাড়ীতে এলে

আরাম পেলুম। তোমাকে দেখি....শুধু দেখি....আজ ভাব করতে এসেছি।

রূপসী ছায়াময়ী....কণ্ঠে এমন ভাষা....প্রেমের ভাষা। ও-বয়সে তার মায়ায় ভুলবে না....এমন তরুণ যুবা জগতে দুর্লভ। মদন তাকে তাড়াতে পারলো না। দুজনে কত কথা। এর পর নিশি-নিশি ছায়াময়ী আসে মদনের ঘরে গভীর রাত্রে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে এবং দুজনে হয় কত কথা। একদিন কিশোরী কোথা থেকে পাশা খেলার সরঞ্জাম এনে বললে—পাশা খেলি এসো। পাশা খেলা চললো।

এবং নিত্য রাতে ছায়াময়ীর সঙ্গে প্রণয় সম্ভাষণ। তার দেহ স্পর্শ করা যায় না··· দেহ নেই....বিদেহিনী....কাজেই দৈহিক কামনার বিন্দু-বাষ্প নেই এ-প্রণয়ে। কিন্তু মদনের শরীর হতে লাগলো কাহিল.... শরীরে রোগ নেই, অথচ দিনে দিনে শীর্ণ হচ্ছে।

দু-এক বছর পরে এখানকার পাঠ শেষ হলো। মদন চললো দ্বারভাঙ্গায়....সেখানে বিখ্যাত পণ্ডিত চিত্রধর মিশ্রের কাছে অধ্যয়ন করতে। পণ্ডিত চিত্রধরের সঙ্গে ছিল সম্পর্ক....তাঁর গৃহে থাকে.... তাঁর কাছে অধ্যয়ন করে। তবে এখানে সে জানালো নিবেদন— একা একটি ঘরে থাকবে....বিশেষ প্রয়োজনে। সে-ব্যবস্থা হলো এবং এখানেও ছায়াময়ী প্রণয়িনী আসে....দুজনে চলে শুধু কথা আর কথা.... প্রণয় ভাষণ।

কিন্তু একদিন হলো—ব্রহ্মচর্য্যাশ্রয়ী মদন এখন পেয়েছে প্রণয়ের স্বাদ....কিন্তু সে-স্বাদ যেন মেটে না। ছায়াময়ীকে বুকে নিতে চায়.... পারে না—চুম্বন বিনিময় চায়....তা হয় না। মন ক্ষুব্ধ হয় এবং এমন

অবস্থায় হঠাৎ একদিন এক কিশোরী ইংরেজ-ললনার রূপে মদন হলো বিহ্বল-বিমুগ্ধ। তাকে দেখতে চায় সর্ব্বক্ষণ....কিন্তু কোথায় সে থাকে জানে না। একদিন ছায়াময়ীকে বলে বসলো—কোথায় ও থাকে....বলো।

ছায়াময়ী বললে—তাকে চাও?

মদন বললে—কোথায় থাকে....জানো?

—জানি। এ-কথা বলে ছায়াময়ী বললে সে-ইংরেজ-ললনার নাম এবং তার ঠিকানা। বলেই তিরোধান।

পাঁচ মিনিট পরে মদন দেখে, নির্জ্জন রাত্রে তার ঘরে সেই রূপসী ইংরেজ-ললনা। সেই বেশ, সেই ভূষা....সেই রূপ, সেই মুখ।

দেখে মদনের ভয় হলো। ছায়াময়ী তাকে নিয়ে এসেছে। কিন্তু মহাবিপদ! সে হলো হিন্দু ব্রাহ্মণের ছেলে, ব্রহ্মচর্য্যব্রতী....তার ঘরে নিশীথ রাত্রে ইংরেজ-ললনা! কেউ যদি দেখে, কেউ যদি শোনে দুজনের কথা, তাহলে সর্ব্বনাশ! জাতিচ্যুত, গৃহচ্যুত....সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় হতে হবে। কিন্তু রূপের এমন মোহ যে, মদন ও-চিন্তা মনে রাখলো না....তার সঙ্গে চললো কথাবার্ত্তা হিন্দী ভাষায়।

দুদিন পরে এ-গোপন রহস্য কেমন করে প্রকাশ হলো। প্রকাশ হলো যে, মদনের ঘরে আসে সেই ভূমিহার জমিদারের মৃতা কন্যা....কখনো স্বরূপে, কখনো ইংরেজ মহিলার রূপে।

মদন জানলো, যে ইংরেজ-ললনা আঁসে, সে আসলে ইংরেজ ললনা নয়....তার ছায়াময়ী। মদন চায় ইংরেজ-ললনাকে....তাই সে এখন আসে সেই ইংরেজ-ললনার বেশে।

এ-ব্যাপার প্রকাশ হতে মিশ্র পণ্ডিত ক্ষিপ্তপ্রায় হলেন—প্রেতিনীর সঙ্গে প্রেম! এমন অনাচার! মদন বললে—সে নিরুপায়। সকলে বুঝলেন, ভূতিনীতে পেয়েছে···তখন যথাবিধি যাগযজ্ঞ হলো এবং মদনকে দেওয়া হলো তন্ত্রসিদ্ধ মাহুলি। এ-মাহুলী ধারণের পর থেকে ছায়াময়ীর দর্শন হলো নিবৃত্ত এবং মদন তাকে ভুলে আবার সহজ সুস্থ মনের মানুষ হয়ে উঠলো।

তেরো

যোগবল···না, Psychic Force ?

মনে আছে, আমাদের তখন তরুণ বয়স····বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে গোড়ার দিকে কুন্দর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে-পরিচ্ছেদ, সেই পরিচ্ছেদের শিরোনামায বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—'ছায়া পূর্ব্বগামিনী'। তখন এমন বহু তরুণকে শুনেছি মন্তব্য করতে (এঁরা তখন ইংরেজী কাব্য নাটক পড়ে দেশের সাহিত্যকে তুচ্ছ করায় নিপুণ হয়েছেন···· দু-চারখানা ইংরেজী নাটক-উপন্যাস পড়ে বলেন, বাঙলায় আবার সাহিত্য আছে না কি ?)····তাঁরা মন্তব্য করতেন—রাবিশ! অর্থাৎ যা ঘটবে, তার আভাস পাওয়া যায় না কি আবার স্বপ্নে ? তাও এমন পুরোপুরি। শুধু তাই নয়, মায় নগেন্দ্র দত্তর চেহারাখানাও কুন্দনন্দিনী দেখলেন স্বপ্নে। কিন্তু এমন যে ঘটে, তার বহু পরিচয় আমরা জীবনে পেয়েছি এবং পাই। এমন বহু কাহিনী, সত্য কাহিনী····উপন্যাসের পরিচ্ছেদ নয়····পূর্ব্বে বলেছি এবং আরো বলবো।

এ ছাড়া 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে শৈবলিনীর আচার সম্বন্ধে রামানন্দ স্বামীর যে সাইকিক পরীক্ষা····সেটিকেও আমার মনে আছে, দু-চারজন সমালোচক 'দুর্বল গ্রন্থি' বলে নিজেদের মূঢ়তা প্রকাশে কুণ্ঠা বোধ করেননি। বঙ্কিমচন্দ্রের তুলনায় তাঁদের বিদ্যাবুদ্ধি যে কীটানুকীটের তুল্য····এ-জ্ঞান যাঁদের থাকে না, তাঁদের কথা সুধীসমাজে গ্রহণীয় নয়! কিন্তু এ-কথার উল্লেখ করছি····শুধু সকলকে আর একবার জানাবার জন্য

যে, বঙ্কিমচন্দ্র এই সাইকিক শক্তিতে সম্পূর্ণ আস্থাবান ছিলেন। এই সাইকিক ফোর্মের একটি কাহিনী বলি :

দক্ষিণ ভারতের ভিনেডেলি জেলায় যে Indian Academy of Science আছে, তার সভাপতি ছিলেন ডক্টর রামস্বামী ডি-এস-সি। এই সমিতির মুখপত্র Self Culture-এ ভেঙ্কটরত্নম নামে এক ভদ্রলোক এক সাধুর অলৌকিক শক্তির যে-বিবরণ দিয়েছেন, তা প্রণিধানযোগ্য।

তিনি লিখেছেন—একদা তিনি তাঁর দুজন বন্ধুর সঙ্গে চলেছিলেন কুমারিকায় মন্দির দর্শনে। পথে এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা। বয়সে বেশ বৃদ্ধ হলেও ব্রাহ্মণের দেহ বেশ জোরালো এবং তাঁর মনের জোর তরুণ বয়সের মতো। আলাপ-পরিচয় না থাকলেও ব্রাহ্মণ এঁদের সঙ্গে আত্মীয়ের মতো মেলামেশা করেছিলেন। যাবার পথে তাঁদের সঙ্গে ভেঙ্কটরত্নমের হিন্দুদর্শন, যোগবল, স্পিরিচুয়ালিজ্‌ম্ সম্বন্ধে অনেক কথা হচ্ছিল। ব্রাহ্মণ বলেছিলেন—না জেনে অবিশ্বাস করে উড়িয়ে দিয়ো না....জানবার চেষ্টা করো, বোঝবার চেষ্টা করো....সব উপলব্ধি করবে।

তিনি যোগবলের অপূর্ব্বতার অনেক কাহিনীও বলেছিলেন। বন্ধু-যুগলের মধ্যে একজনের মেজাজ ছিল উদগ্র....বিলাতী ধাঁচের। ব্রাহ্মণের কথায় তিনি টীকা-টিপ্পনী যা কাটছিলেন, তা থেকে তার নিজের দর্প এবং ব্রাহ্মণের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ পাচ্ছিল। ব্রাহ্মণ যেন তা গ্রাহ্য করচেন না....এমনি ভাব ছিল ব্রাহ্মণের বাক্যে এবং আচরণে।

তার পর কুমারিকায় পৌঁছে মন্দিরে যাবার পথে ব্রাহ্মণ হঠাৎ সেই দর্পী ভদ্রলোকের হাতখানি স্পর্শ করেছিলেন। স্পর্শমাত্রে তাঁর হাত

উর্দ্ধে উত্তোলিত হলো এবং উর্দ্ধে উত্তোলিত সে-হাত কঠিন....as stiff as an iron rod এবং সে-হাতে দারুণ দাহ-যাতনা। দর্পী চীৎকার করে উঠলেন....হাত নামাতে পারেন না....হাত নাড়তে পারেন না।

ব্রাহ্মণ বললেন—কি হলো?

দর্পী কাতর কণ্ঠে বললেন—বাঁচান! আমার হাত নামাতে পারছি না....ভয়ানক যাতনা হচ্ছে!

তাঁর কপালে দরদর ঘাম....মুখ আর্ত্ত, আতুর।

ব্রাহ্মণ তখন হেসে তাঁর হাতখানি ধরে একটি মন্ত্র উচ্চারণ করলেন....করে বললেন—নামাও হাত।

দর্পী হাত নামালো।

ব্রাহ্মণ বললেন—যাতনা গিয়েছে?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

ব্রাহ্মণ বললেন—যা হলো....এ থেকে বুঝলে, Psychic force কাকে বলে?

মাথা নীচু করে মার্জ্জনা চেয়ে দর্পী বললেন—আমাকে ক্ষমা করুন....আমি না বুঝে অপরাধ করেছিলুম।

ব্রাহ্মণ বললেন—যে সম্বন্ধে কিছু জানো না....তা নিয়ে অবজ্ঞা করো না। তোমাদের ইংরেজ কবি বলে গেছেন, There are more things in Heaven and Earth than are dreamt of in your philosophy.

তার পর যোগবল নিয়ে আরো কথা হয়। ব্রাহ্মণ বললেন—একবার ষ্টেজে নাট্যাভিনয় হচ্ছিল....মঞ্চে পাত্রপাত্রীরা অভিনয় করছে....দর্শকের

দল অভিনয় দেখছে....আমার উপর হলো নির্দ্দেশ—পারেন কিছু আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখাতে? তখন হাত নেড়ে বলেছিলুম—ষ্টেজের পাত্র-পাত্রীরা এবং দর্শকের দল, স্তম্ভিত মূক হয়ে থাকো পাঁচ মিনিট.... পাথরের পুতুলের মতো সব চুপচাপ থাকবে। এবং তাই ঘটেছিল। এ-বিবরণ খবরের কাগজে তাঁরাই লিখে ছাপিয়েছিলেন।

ভেঙ্কটরত্নম বললেন—যদি অপরাধ না নেন....সামান্য কিছু দেখান যদি!

ব্রাহ্মণ তখন তাঁদের বললেন—একটা নুড়ি পাথর এনে দাও।

নুড়ি পাথর আনা হলো। তিনি সেটি হাতে ধরে তাতে কি মন্ত্র পড়ে নুড়ি পাথরটুকু পথে রাখলেন.. সে নুড়ি পাথর ব্যাঙের মতো লাফাতে লাফাতে অনেকখানি পথ অতিক্রম করে গেল।

চোদ্দ

জীবন-দান

ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয়ের কথা পূর্ব্বে বলেছি। তিনি যেমন জ্ঞানী ছিলেন, তেমনি সুলেখক....ইংরেজী-বাঙলা দুটি ভাষাতেই তাঁর লেখনীতে যেন পুষ্পবর্ষণ হতো। তার উপর তিনি শুধু ট্রেনে চড়ে নয়, পদব্রজে ভারতের সর্ব্বতীর্থ এবং নানা দেশ পরিভ্রমণ করেছিলেন ....পরিক্রমণকালে সে-সব গ্রাম বা নগরের লোকজনের সঙ্গে সমান-সমান ভাবে মিশেছেন, আলাপ-আলোচনা করেছেন, তাদের কাছ থেকে কত রকমের কত কাহিনী সংগ্রহ করে তার অনেকগুলি লেখনীমুখে প্রকাশ ও প্রচার করে গিয়েছেন। তিনি তন্ত্রসিদ্ধ ছিলেন....তন্ত্র-মন্ত্র সম্বন্ধে তাঁর একখানি গ্রন্থ আছে....ইংরেজীতে লেখা....Tantricks and Tantrism. জানি না, বাঙলা ভাষায় সে-গ্রন্থ আছে কি না...তবে সে ইংরেজী গ্রন্থখানি আমি বহুকাল পূর্ব্বে পড়েছিলুম। সম্প্রতি সে-গ্রন্থের পৃষ্ঠা থেকে দুটি অপূর্ব্ব কাহিনী সঙ্কলিত করছি।

তীর্থ পর্য্যটনকালে এটোয়ায় এক সিদ্ধ-তান্ত্রিকের আশ্রমে তিনি বহুকাল ছিলেন....তাঁর অলৌকিক শক্তি দেখে মহাভারতী মহাশয় তাঁকে গুরু বলে মেনে তাঁর কাছ থেকে বহু শিক্ষা লাভ করেছিলেন। এই সিদ্ধ-তান্ত্রিকের আদিবাস গুজরাটে...সেইখানেই ছিল তাঁর সাধনার ক্ষেত্র....তিনি ছিলেন পরম যোগী। যমুনার কূলে এটোয়া....এটোয়ায় এসে তিনি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে বাস করছিলেন....তাঁর বহু শিষ্য ছিল।

আশ্রমে তিনি সাধনা করতেন এবং শুধু এদেশী সাধারণ মানুষ নয়··· এদেশের বহু কৃতবিদ্য ব্যক্তি, তখনকার দিনের পদস্থ বহু ইংরেজ, এমন কি ও-অঞ্চলের মুসলমান নবাবরাও এঁকে গুরুর মতো ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন, মানতেন।

এঁর সঙ্গে এটোয়ায় অবস্থানকালে মহাভারতী মহাশয় গুরুর অলৌকিক নানা শক্তি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। অনেকগুলির তিনি উল্লেখ করেছিলেন····সেগুলির মধ্য থেকে এখানে দুটি ঘটনার কথা উল্লেখ করছি।

প্রথম ঘটনা—মহাভারতী লিখেছেন····একদিন আশ্রমের সামনে মুক্ত প্রান্তরে রৌদ্রালোকে তিনি, তাঁর এই গুরু এবং কজন শিষ্য শাস্ত্রালোচনা করছেন····এমন সময় দূরের কোন গ্রাম থেকে কজন লোক বাঁশে বেঁধে এক শব নিয়ে এসে হাজির। আশ্রমের সামনে শব নামিয়ে তারা বললে ব্যাপার—লোকটি কোন্ ঝিলের বাঁধে কি কাজ করছিল····বেশ উঁচু বাঁধ····হঠাৎ বাঁধের উপর থেকে সে ঝিলের জলে পড়ে যায়। ঝিলে গভীর জল····জলে পড়বামাত্র সাঁশের ড্যালার মতো তখনি জলমগ্ন হয়। কাছাকাছি লোকজন ছিল····পড়বার সময় লোকটি আর্ত্ত চীৎকার তোলে····সে-চীৎকার শুনে তারা আসে ছুটে এবং প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে সন্ধানের পর তার দেহ তারা তোলে জল থেকে—তখন এ একেবারে মরে ঢোল।

যোগী এ-কথা শুনলেন····শুনে তাঁর কজন শিষ্যকে বললেন—হুঁ, তোমরা এক কাজ করো। এর দেহ আমার পূজার ঘরে নিয়ে গিয়ে কাপড় চাপা দিয়ে রাখো····আর কখানা হাড় আর একটা মড়ার

মাথা (skull) রাখো আমার পূজার আসনের সামনে। রেখে তোমরা ফিরে এলে আমি গিয়ে যথাবিহিত ব্যবস্থা করবো।

শিষ্যরা শবদেহ নিয়ে গিয়ে সাধুর সাধন-ঘরে শুইয়ে রাখলো....অবশ্য বাঁশের দড়ির বাঁধন কেটে। তার পর সাধুর কথামতো শবের যথারীতি ব্যবস্থা সম্পাদন করে তারা এলো বাহিরে সাধুর কাছে প্রায় এক ঘণ্টা পরে....ইতিমধ্যে বাহিরে আর এক কাণ্ড !

শবকে নিয়ে কজন শিষ্য এবং শববাহীর দল ভিতরের ঘরে আছে.... তখন কোথা থেকে আর একদল লোক আর একটি দেহ নিয়ে এসে উপস্থিত। ব্যাপার তারা বললে—ওখান থেকে প্রায় বারো ক্রোশ দূর থেকে তারা আসছে। দেহটি একজন স্ত্রীলোকের....স্ত্রীলোকটিকে কাল সন্ধ্যার সময় মাঠে সাপে কামড়েছে·· ঝরঝরিয়ে রক্তপাত! ওখানে এক সাপের ওঝা ছিল....তাকে আনিয়ে যথাসাধ্য পরিচর্য্যাদি করা হয়....কিন্তু ওঝা এ-বিষ নাশ করতে পারলো না। শেষ রাত্রে এর মৃত্যু হয়েছে। তাই নিরুপায়ের উপায় সাধুজীর কাছে তারা একে এনেছে....চরণধূলি স্পর্শে একে বাঁচিয়ে দিতে হবে।

যোগী হাসলেন....হেসে তিনি শিষ্যদের বললেন—এটিকেও ঘরে নিয়ে গিয়ে ও-ব্যক্তির শবের পাশে রাখো এবং এর সর্ব্বাঙ্গে কাপড় চাপা দিয়ে কখানা হাড় এবং একটা মড়ার খুলি রাখো।

মহাভারতী লিখেছেন—·আমি সেখানে বসে এ-সব প্রত্যক্ষ করছি। প্রায় আধঘণ্টা পরে শিষ্যেরা এসে বললে—আপনার আজ্ঞা যথাযথ পালন করেছি। তখন সাধু উঠে ঘরে গেলেন এবং ঘরের কপাট দিলেন বন্ধ করে। তার পর ঘরের মধ্যে কি যাগযজ্ঞ করলেন, জানি

না....তবে মাঝে মাঝে মন্ত্র উচ্চারিত হতে শুনলুম।

সন্ধ্যার সময় কপাট খুলে সাধু এলেন ঘর থেকে বেরিয়ে....তাঁর পিছনে এলো জীবন্ত মূর্ত্তিতে সেই দুই ব্যক্তি....সহজ সুস্থ মানুষের মতো।

কি করে এমন হলো, সাধুই জানেন....সে-সম্বন্ধে তাঁকে কেউ কোনো প্রশ্ন করলেন না। মহাভারতী শুধু বলেছিলেন—মৃত ব্যক্তিও তাহলে বেঁচে ওঠে ?

জবাবে সাধু বলেছিলেন—না। বিধাতার দেওয়া আয়ু যে-দিন যে-ক্ষণে নিঃশেষ হবার কথা, হবেই....তবে এ-মৃত্যুর দিনক্ষণকে আমরা সাধন-ভজনের দ্বারা কিছু অদল বদল করে দিতে পারি। অর্থাৎ আজ এখন যার মৃত্যু নির্দ্ধারিত, মন্ত্রাদির সাহায্যে আরো একদিন কিম্বা দু-তিন দিন মাত্র তাকে বাঁচিয়ে রাখা যায়....তার বেশী নয়। সে-চেষ্টা করা পাপ বটে....আর সে-চেষ্টা কখনো সফল হতে পারে না।

মহাভারতী প্রশ্ন করলেন—এ দুজনের আয়ু কি শেষ হয়েছে ?

যোগী বললেন—না। অনেক সময় এই জীবন্মৃত অবস্থায় আমরা না জেনে মানুষের দেহ দাহ করি বা তাকে কবরে ফেলে মাটী চাপা দিই। এজন্য আমাদের এদেশে প্রথা আছে—সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে দাহ করা উচিত নয়....কোনো মুক্ত স্থানে তার দেহ রাখা উচিত....দুদিন অন্ততঃ। তার মধ্যে কেউ কেউ বিষ কাটিয়ে আবার সুস্থ হয়ে উঠতে পারে।

দ্বিতীয় ঘটনাটি :—

মহাভারতী লিখেছেন—ঐ এটোয়ার কাহিনী। এই যোগী-গুরুর কাছে তিনি বহুদিন বাস করেছিলেন তাঁর আশ্রমে....সেখানে থাকবার

সময় একদিন হঠাৎ আশ্রমে এলেন দিল্লীর তদানীন্তন যুগের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক হেমচন্দ্র সেন। হেমবাবুর জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন জয়পুর মহারাজার মন্ত্রী। দিল্লীতে হেমবাবুর যেমন খ্যাতি তেমনি পশার। তিনি গিয়েছিলেন কলকাতায়....কলকাতা থেকে ফেরবার পথে এটোয়ায় নামলেন যোগী-গুরুর সঙ্গে দেখা করতে। এঁর নাম কেউ জানতো না....এ-অঞ্চলের সকলে বলতো, 'খুটখুটে বাবা' এবং এই নামেই ছিল তাঁর পরিচয়। হেমবাবু শুনেছিলেন, তিনি এটোয়ায় আছেন....তাই তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যই তিনি এটোয়ায় জার্ণি ব্রেক করলেন।

হেমবাবুর অখণ্ড বিশ্বাস অধ্যাত্মতত্ত্বে....তিনি ছিলেন থিয়সফিষ্ট....এবং পরলোকতত্ত্ব নিয়েও চর্চা করতেন। যোগী তাঁকে খুব স্নেহ করতেন, শ্রদ্ধা করতেন। এটোয়ায় তিনি এলেন—তাঁর সঙ্গে ছিল শুধু এক পশ্চিমা ভৃত্য....বহুদিনের ভৃত্য....তার বাড়ীও এটোয়ার পাশাপাশি গ্রামে। হেমবাবু এলেন সাধুর আশ্রমে। ভৃত্য তার বাড়ী গিয়ে সকলকে দেখে আশ্রমে এসে জুটবে—কথা রইলো।

ভৃত্যটির এক কন্যা ছিল চিররুগ্না....তার বয়স তখন পনেরো-ষোল বছর—এত বয়সেও তার বোধশক্তি শিশুর মতো....এবং হাবা—অর্থাৎ সে কথা কইতে পারতো না—কথা যা বলতো—অর্দ্ধস্ফুটভাবে—নিজেকে ঠিক প্রকাশ করতে পারতো না....তার ভাব ভঙ্গী এবং মুখের অর্দ্ধস্ফুট কতকগুলো বাক্য থেকে সকলে বুঝতো....কি সে বলতে চায়। ভৃত্য যখন বাড়ী গেল—তখন তার সে কন্যার নানা উপসর্গ হয়েছে—এবং জীবনের দীপ নিব নিব। হেমবাবু সে-কন্যার এমন সাংঘাতিক অবস্থার কথা জানতেন না....তিনি শুধু জানতেন—ভৃত্যের কন্যা হাবা-বোবা—

তাকে তিনি কখনো দেখেননি। হেমবাবু আশ্রমে এলেন—শিষ্যরা বললেন—সাধুজী তাঁর ঘরে এবং কোথাকার নবাব এসেছেন তাঁকে সেলাম জানিয়ে, নানা বিষয়ের আলোচনা করতে, হেমবাবুকে বেশ খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। হেমবাবু তখন বসলেন—বাহিরে।

প্রায় বিশ মিনিট পরে সাধুজী বললেন বেশ উচ্চ কণ্ঠে বাহিরে তাঁর যে শিষ্যেরা আছে, তাদের উদ্দেশে—(হিন্দী ভাষায় বললেন)—সেন বাবুকে বসিয়ে রেখো না—তাঁকে ঘরে আসতে বলো!

এ-কথা শুনে শিষ্যদের ইঙ্গিতে হেমবাবু ঢুকলেন সাধুর ঘরে—সাধু বললেন নবাবকে—আপনি এখন বাহিরে বসুন গিয়ে—সেনবাবুর সঙ্গে আমার একটু কাজ আছে।

নবাব বাহিরে গেলে সাধু বললেন হেমবাবুকে—আপনার সঙ্গে যে-লোকটি এসেছে, সে এখনি আসবে, তার মেয়েকে নিয়ে। সে-মেয়ে মারা গেছে ভেবে সকলে কান্নাকাটি করছে—আমি এখান থেকেই তার উদ্দেশে আহ্বান জানিয়েছি····তার সে মরা-মেয়েকে নিয়ে সে-লোক এখনি আসবে!

মহাভারতী লিখেছেন—তিনিও তখন সেখানে উপস্থিত····হেমবাবুকে সাধুজী এ-কথা বলবার দশ পনেরো মিনিট পরে হেমবাবুর সেই পশ্চিমা ভৃত্য এসে আশ্রমে হাজির—তার কাঁধে মৃতা কন্যার শব। ভৃত্য বললে—বাড়ী গিয়ে দেখি, মেয়ে মারা গেছে····সকলে কান্নাকাটি করছে! দেখে আমি বসে পড়লুম····সঙ্গে সঙ্গে শুনলুম—আমাকে কে ডাকছেন আমার নাম ধরে! চারিদিকে চেয়ে কাকেও দেখলুম না। কে ডাকে —ভাবছি····সঙ্গে সঙ্গে শুনলুম—তোর বেটিকে নিয়ে এখনি চলে আয়!

আশ্রমে—ও-মেয়েকে সারিয়ে দেবো। এ-কথা শুনে আর এক মিনিট দেরী নয়—মেয়েকে ঘাড়ে তুলে ছুটে এখানে এসেছি।

সাধুজী তাকে বললেন—মেয়েকে ঘরে নিয়ে এসো।

ভৃত্য তার কন্যাকে নিয়ে ঘরে ঢুকলো। সাধু বললেন—ওকে শুইয়ে দাও—দিয়ে ওর আপাদমস্তক কাপড় চাপা দিয়ে ঢেকে দাও—তার পর তোমরা সকলে এ-ঘর থেকে বেরিয়ে যাও।

তাই হলো। সাধু ডাকলেন তাঁর দুজন শিষ্যকে। বললেন—মড়ার হাড় দাও দুটো—হাতের হাড়—আর একটা খুলি। তারা তাই করলো। শিষ্যদের ঘর থেকে বার করে দিয়ে সাধু সে-ঘরের দরজা বন্ধ করলেন—তার পর ভিতরে মন্ত্র উচ্চারণ এবং তাঁর কী সব প্রক্রিয়া চলতে লাগলো।

প্রায় আধ ঘণ্টা—তার পর দরজা খোলা হলো। মেয়ে এলো বাহিরে—সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষ....জীবন্ত দেহে। শুধু তাই নয়—সে-মেয়ের মুখে ফুটলো তার বয়সোচিত ভাষা। সে হাবার ভাব সম্পূর্ণ তিরোহিত —শিশুর মতো সে ভাবও নেই....লজ্জাবতী কিশোরী।

তাকে প্রশ্ন করা হলো—কি প্রক্রিয়া করলেন সাধুজী?

সে বললে—বলা নিষেধ—তবে আমার মনে হলো—আমার দেহমনের উপর দিয়ে যেন বিদ্যুতের প্রবাহ বয়ে গেল···তার পর ঘুম ভেঙ্গে চোখ চাইলুম—সাধুজী বললেন—যা বেটী, তুই আরাম হয়ে গেছিস।

মহাভারতী লিখেছেন—এ-কটি ঘটনার রহস্য আমার কাছে আজও অমীমাংসিত রয়ে গেছে। এ সম্বন্ধে সাধুজীকে কোনো প্রশ্ন করিনি—তবে এ বিশ্বাস আমি করি···তন্ত্রশাস্ত্র বুঝে রীতিমত অনুশীলন করলে জীবনের বহু আধি-ব্যাধি থেকে আমরা সহজেই মুক্তিলাভ করতে পারি!

পনেরো

যোগিনীর বায়ুচারা মন

এ-কাহিনীটিও ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয় লিখেছেন....তাঁর আপন অভিজ্ঞতার অত্যাশ্চর্য্য কাহিনী।

তিনি লিখেছেন—ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল পর্য্যটনকালে কদিন তিনি ছিলেন জৌনপুর জেলার হরিয়াদা সহরে ওখানকার তহশীলদারের অতিথি হয়ে তাঁর গৃহে। তখন তহশীলদারদের সেকণ্ড ক্লাস মুন্সিফ এবং সেকণ্ড গ্রেড ম্যাজিষ্ট্রেটের 'পাওয়ার' ছিল। তহশীলদার বেশ ধর্ম্মপরায়ণ....দেবতা ব্রাহ্মণ যোগী সন্ন্যাসীকে খুব ভক্তিশ্রদ্ধা করতেন। একদিন সকালে তাঁর সঙ্গে বসে কথা কইছি, এমন সময় স্থানীয় থানার সাব-ইন্‌স্‌পেক্টর তাঁর জমাদারকে সঙ্গে নিয়ে এলেন....এসে রিপোর্ট পেশ করে বললেন—একটা পাগলী আজ কদিন, হুজুর, সহরের পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ছেঁড়া টেনা পরা....কথা কয় না....কোনো কথা জিজ্ঞাসা করলে শুধু হাসে, জবাব দেয় না। কারো কাছে ভিক্ষা চায় না....পয়সা কড়ি নেই। পাগলীর ঘর নেই, আস্তানা নেই, আত্মীয়বন্ধু কেউ নেই.... কোথায় শোয়, কেউ জানে না....কি খায়, খেলেও কোথায় খাবার পায়, কেউ জানে না। কোন্ জাতের মানুষ, কি তার ধর্ম্ম....তাও কেউ জানে না। কেউ যদি দয়া করে তাকে কোনো খাবার দেয়....হাত পেতে নেয়....নিয়ে হেসে সে-খাবার মুখে পরে। এ মন পাগলী পথে ঘুরে বেড়ায়....তাই রিপোর্ট লিখে এনেছি, হুজুর....দয়া করে হুকুম দিন, ওকে

পাগলা গারদে পাঠাই।

তহশীলদার বললেন—কোনো রকম শান্তিভঙ্গ করেছে কারো? কাকেও তাড়া করেছে কিম্বা কারো অনিষ্ট করেছে?

অফিসার বললেন—না হুজুর। তবে পথে পথে ঘোরে....আস্তানা নেই....অন্ন-সংস্থানের উপায় নেই....কাজেই ১০৯ ধারা খাটে তো! তাছাড়া ও পাগল....তাই এ-হুকুম চাইছি।

মাথা নেড়ে তহশীলদার বললেন—না, না, না....হুট বলতেই এমন হুকুম দিতে পারি না....তেমন হুকুম দিলে ঘোর অধর্ম্ম হবে। জানেন ইন্‌স্‌পেক্টরবাবু, আমাদের দেশে ছেঁড়া কানি পরে পাগলের মতো অনেক মানুষ ঘোরে....মাঝে মাঝে দেখি....জানেন, তাঁদের মধ্যে কত মহাপুরুষ আছেন! পাগলের বেশ হলেও তাঁরা আমাদের মতো মানুষের চেয়ে অনেক বড়....তাঁরা মহাপুরুষ। এ-পাগলী যদি তেমন কেউ হন! ছুদিন আমাকে চিন্তা করতে দিন....তার পর আমি এঁর সম্বন্ধে বিহিত ব্যবস্থা করবো।

অফিসার হুকুম পেলেন না....নিরাশ হয়ে চলে গেলেন।

এর ছুদিন পরে....নিত্যকার মতো সহরের শেষ প্রান্তে আছে মস্ত দীঘি....দীঘিতে পরিষ্কার জল....সেই পুকুরে সকালে আমি চলেছি স্নান করতে। স্নান সেরে ফিরে আসবার পথে দেখি, মাঠের ধারে বড় গাছ.... সেই গাছতলায় দাঁড়িয়ে একটি স্ত্রীলোক। তাঁর মুখে কেমন একটা জ্যোতি ....পরণে ছেঁড়া ময়লা কানি....তাহলেও ছুটি চোখে আশ্চর্য্য দীপ্তি.... দেখলে মনে হয়, যেন ইহলোকের মানুষ নন। মনে হলো, ইনিই সেই ইন্‌স্‌পেক্টরের দেখা পাগলী! হাসি পেলো....পাগলী বলে এঁকে ইনি

যোগিনী। কাছে গেলুম....তাঁর অধরকোণে মিষ্ট হাসি। তাঁর পায়ের কাছে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলুম। স্নান করে উঠে কটি ফল কিনেছিলুম ....তাঁকে দিলুম....তিনি হাসিমুখে গ্রহণ করলেন। তারপর আমি দু হাত জোড় করে তাঁকে মিনতি জানালুম, আমার সঙ্গে তহশীলদারের গৃহে এসে থাকবার জন্য। ভক্তিভরে তাঁর সেবা করবো, বললুম। তিনি শুধু হাসলেন....হেসে ঘাড় নেড়ে জানালেন, আসতে পারবেন না এবং ইশারায় বোঝালেন, তিনি হরিয়াদা ত্যাগ করে দূরে অন্য গ্রামে যাবেন!

আমি বাড়ী ফিরে তহশীলদারকে এ-কথা বললুম। শুনে তিনি বললেন—ভগবান খুব রক্ষা করেছেন। ভাগ্যে, পুলিশের কথায় আমি সে-হুকুম দিইনি! তার পর যোগিনীর সন্ধানে তিনি লোক পাঠালেন... লোকজন ফিরে এসে বললে—কোথাও তাঁকে পাওয়া গেল না।

এ-ঘটনার কদিন পরে প্রয়াগে যোগের স্নান....মস্ত মেলা হবে....সে-মেলায় বহু সাধু-সন্ন্যাসীর সমাগম হবে। আমি সে-যোগে স্নান করতে যাবার উদ্যোগ করছি....তহশীলদার বললেন, তিনি আমার যাবার ব্যবস্থা করবেন। তিনি বললেন, তিনি গাড়ীর ব্যবস্থা করবেন....তেজী দু-ঘোড়ার ফীটন গাড়ী। হরিয়াদা থেকে প্রয়াগের এপারে যোশী হলো প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে....এ-পথে তিনটে পুলিশ-চৌকিতে ডাকের ঘোড়া রেডি থাকবে। এখান থেকে যে-ঘোড়া বেরুবে গাড়ী নিয়ে, সে-ঘোড়া বদলে প্রথম চৌকি থেকে নতুন দুটি ঘোড়া বদল। তার পর এমনিভাবে আরো দুটি চৌকিতে ঘোড়া বদল করে যাওয়া। চৌদ্দ-পনেরো ঘণ্টার মধ্যে যোশী পৌঁছে যাবো....কোনো কষ্ট হবে না....একদিনে পৌঁছুবো এবং আরামে যাবো।

তাই হলো। যোগের আগের দিন সকালে গাড়ী তৈরী তহশীলদারের ফটকে....আমি যাবো একা....গাড়ীতে কোচম্যান আর একটা সহিস। তিনজনে যাবো....গাড়ীতে উঠবো....দেখি, বাড়ীর সামনে খানিকটা খোলা জায়গা, সে-জায়গায় সেই যোগিনী ধীর পায়ে পায়চারি করচেন। তহশীলদারকে দেখালুম। তিনি এবং আমি দুজনে তখনি তাঁর কাছে গেলুম....তাঁকে ভক্তিভরে প্রণাম করলুম। তহশীলদার একপাত্র দুধ এনে দিলেন, ফল দিলেন....তিনি নিলেন এবং তা খেলেন। তহশীলদারবহু মিনতি করলেন—দয়া করে আমার এখানে পায়ের ধুলো দিন....দু-চার দিন থাকুন....আমরা সেবা করে কৃতার্থ হবো। তিনি মলিন হাসি হাসলেন....হেসে মাথা নেড়ে ইশারায় জানালেন, তিনি

এখনি চলেছেন....অনেক দূরে....থাকতে পারবেন না। আমি বললুম —প্রয়াগে যাবেন যোগে স্নান করতে? সেখানে বহু সাধু-সন্ন্যাসীর সমাগম হবে। তিনি ইশারা করে চাইলেন একখানা শ্লেট এবং একটি পেন্সিল। শ্লেট-পেন্সিল দেওয়া হলো....তিনি তখন শ্লেটে লিখলেন.... সংস্কৃত অক্ষরে লিখলেন—প্রয়াগের মেলায় তোমার সঙ্গে দেখা হবে।

আমি বললুম—আমি যাচ্ছি সেখানে....দয়া করে এ-গাড়ীতে চলুন.... কষ্ট হবে না।

তিনি আবার শ্লেটে লিখলেন—না। আমার জন্য ভেবো না.... যথাসময়ে আমি সেখানে পৌঁছুবো....দেখা হবে।

লেখা হলে শ্লেটখানি তিনি দিলেন আমার হাতে। আমরা সকলে মিলে একসঙ্গে শ্লেটের লেখা পড়লুম....পড়া শেষ হলে চেয়ে দেখি, তিনি নেই....চকিতে বাতাসে মিলিয়ে অদৃশ্য হয়েছেন।

মহাভারতী লিখচেন—ঘোড়ার ডাক বদল করে এলাহাবাদের এপারে ঘোশীর ঘাটে আমি পৌছুলুম····রাত তখন পৌণে এগারোটা। কোচম্যান, সহিসকে বিদায় দিয়ে আমি ঘাটে নামছি····নৌকো নিয়ে নদী পার হয়ে ওপারে প্রয়াগে নামবো···কোচ্যমান চীৎকার করে উঠলো—তাজ্জব হ্যায় ····তাজ্জব হ্যায়! আমি পিছন ফিরে তাকালুম····দেখি, যেন ভূত দেখেছে····এমনি ভাবে আড়ষ্ট হয়ে কোচম্যান দাঁড়িয়ে আছে। আমি এলুম তার কাছে····বললুম—কি তাজ্জব হ্যায়!

আঙুল দিয়ে সে যা দেখালো····দেখি, পথের ধারে একটা দোকানের পাশে গাছতলায় দাঁড়িয়ে সেই যোগিনী। দোকানের আলো পড়েছে তাঁর উপর····স্পষ্ট দেখলুম তিনিই।

কোচম্যান বললেন—সেই মায়িজী, হুজুর। সকালে তহশীলদার সাহেবের বাঙলোর সামনে দেখেছি····আর এখন দেখচি, উনি এখানে। বড়ি তাজ্জব-কী বাত!

তাজ্জবই বটে! পাশের দোকানদারকে বললুম—ওঁকে জানো?

দোকানদার বললে—না মশায়। আজ বিকেল তিনটে থেকে ওকে দেখচি, এখানে ঘুরঘুর করছে।

দোকানীর এক খদ্দের বললে—আমি ওকে দেখেছি, আগের মহল্লার মোড়ে বড় কুয়াতলা····সেই কুয়াতলায়····বেলা তখন দুটো।

আশ্চর্য্য! আমি গেলুম যোগিনীর কাছে····প্রণাম করে তাঁর পায়ের ধুলা নিলুম। তিনি আমার দিকে চেয়ে হাসলেন।

তার পর বহু মিনতি, বহু আবেদনে-নিবেদনে তাঁর কণ্ঠে ভাষা ফোটালুম····তিনি কথা বললেন হিন্দীতে।

আমি প্রশ্ন করলুম—কি করে এত শীঘ্র আপনি এলেন? আমি অমন তেজী ঘোড়ার গাড়ীতে এসেছি····তাতেই আমি পৌঁছেচি রাত এগারোটায়····আর আপনি এসেছেন এখানে শুনছি, বেলা দুটোয়।

হেসে তিনি বললেন—ঘোড়ার চেয়ে জোরে চলে বাতাস····আমি এসেছি বাতাসের চেয়ে আরো জোরে ছোটে যে-মন, সেই মনের শক্তিতে। ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে যদি ভগবানের দয়ার যোগ থাকে, তাহলে চকিতে মানুষ সাত সমুদ্র পার হতে পারে।

আমি বললুম—এ-শক্তি কি সব মানুষ পায়?

তিনি বললেন—ইচ্ছাশক্তি সব মানুষের আছে····তবে এ-শক্তিকে বাড়ানো চাই। বাড়াতে হলে সাধনা করতে হবে····দু দিন চার দিন দু বছর চার বছরের সাধনা নয়····নিত্য দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর····তাহলে ইচ্ছাশক্তির দৌলতে চকিতে মানুষ ত্রিভুবন বিচরণ করতে পারবে। সব মানুষের মন····জেনো, উর্ব্বর ক্ষেতের মতো····যে-ফশল ফলাতে চাও····বীজ বুনে একাগ্র সাধনা করো, যত্ন করো···· অভীষ্ট ফশল পাবে প্রচুর। মনে রেখো, ভগবান চোখ দিয়েছেন···· সে-চোখে দৃষ্টি দিয়েছেন····সে দৃষ্টিতে পৃথিবী দেখতে হয় কি করে, মানুষ তা জানে না····মানুষের দুর্ভাগ্য!

ষোল

যোগী ওঙ্কার দেও বাবা

ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয় শুধু জ্ঞানী, গুণী এবং সুলেখক ছিলেন না....তিনি ছিলেন তান্ত্রিক। তাঁর লেখা বহু বিষয়ে বহু সন্দর্ভ সেকালে (১৯০৬–১০) 'ভারতী' এবং 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হতো। 'বঙ্গদর্শন' যখন রবীন্দ্রনাথ সম্পাদন করেন, তখন বঙ্গদর্শনে তাঁর সন্দর্ভাদি প্রকাশিত হতো।

তিনি ভারতে, আফগানিস্থানে, সিঙ্গাপুরে, সিংহলে বহু স্থান পর্য্যটন করেছিলেন এবং বহু দেশে অলৌকিক বহু বস্তু দেখেছিলেন। তাঁর নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা....যোগী ওঙ্কার দেও বাবার সম্বন্ধে...সঙ্কলিত করে দিচ্ছি।

মহাভারতী মহাশয় লিখেছেন—ক' বছর আগে উত্তর ভারতে পর্য্যটনকালে একদিন সন্ধ্যায় আমি নামলুম থানেশ্বর ষ্টেশনে....কুরুক্ষেত্র দর্শনে যাবো বলে। থানেশ্বর ষ্টেশন থেকে কুরুক্ষেত্র যাওয়া সহজ হয়।

বর্ষা চলেছে....বৃষ্টি হচ্ছিল....তখনো আকাশে ঘন কালো মেঘ। ষ্টেশন থেকে কুরুক্ষেত্র দু মাইল দূরে। আমি সোজাসুজি কুরুক্ষেত্রে না গিয়ে ওখানে এক বাঙালী ভদ্রলোকের গৃহে গিয়ে উঠলুম। তাঁর নাম বী, সরকার....তিনি ওখানকার আমেরিকান প্রেস প্রিটেরিয়ান চার্চে সংশ্লিষ্ট। তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল শাহারাণপুরে....সরকার তখন সেখানকার স্কুলে হেডমাষ্টার। সরকারের পত্নী পাঞ্জাবি মহিলা।

তাঁরা দুজনে আমাকে সাদর আতিথ্যে পরিতৃপ্ত করলেন। রাত্রে শোবার ব্যবস্থা হলো ভালো একটি ঘরে....বাড়ীখানি একতলা বাঙলো। আমি বললুম—ঘরে শোবো না। ঘরের সামনে বেশ চওড়া ঢাকা বারান্দা...সেই বারান্দায় খাটিয়া পাতিয়ে দিন....সেখানে শোবো।

তাঁদের আপত্তি....কিন্তু আমার সনির্বন্ধ অনুরোধে বারান্দায় খাটিয়া পেতে সেখানে আমার শোবার ব্যবস্থা হলো।

খাওয়া দাওয়া সেরে, খানিকক্ষণ গল্প-সল্প করে যে যার বিছানায় শোওয়া। আমার সঙ্গে ছিল একটা ঝোলা—সেই ঝোলার মধ্যে আমার যা কিছু সম্পত্তি, অর্থাৎ আমার যত সংস্কৃত গ্রন্থ...দেশী গাছগাছড়ার তৈরী কতকগুলো ঔষধ... ছোট থলির মধ্যে আমার টাকাকড়ি (নোট-টাকা আর রেজকি)....আর দুখানি বহু মূল্য পুস্ত ভাষায় লেখা মুসলমানী ধর্ম্মগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি। এ দুখানি কান্দাহার থেকে আমি পূর্ব্বে সংগ্রহ করে এনেছি। এ-সব জিনিষ আমার ঝোলার মধ্যে।

সরকার সাহেবের বিছানায় তাঁদের দেওয়া বালিশের নীচে আমার সে ঝোলা রেখে বালিশে মাথা দিয়ে আমি শুয়ে পড়লুম। শোবামাত্র নিদ্রা...গাঢ় নিদ্রা।

রাত তখন প্রায় তিনটে....বুকের উপর ভারী চাপ অনুভব করলুম ....নিশ্বাস বন্ধ হবার জো....আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘুম ভাঙ্গতে ফালি চাঁদের স্তিমিত আলোয় দেখি, বেঁটে কালো জোয়ান একটা মানুষ আমার বুকে চেপে বসেছে....সিঙ্গাপুর পেনাঙ অঞ্চলের মানুষের মতো এ-লোকটার চেহারা। কষ্টে তাকে বুক থেকে নামালুম। নামাবামাত্র

দেখি, আমার বালিশের নীচে থেকে আমার সর্ব্বস্ব যে-ঝোলার মধ্যে, সেই ঝোলা নিয়ে সে পালালো। আমি তার পিছনে খানিকদূর ধাওয়া করলুম....কিন্তু চক্ষের পলকে সে যেন বাতাসে মিলিয়ে অদৃশ্য হলো।

আমি হতভম্ব....সর্ব্বস্ব গেল! টাকাকড়ির জন্য তত বেদনা বোধ হলো না....কিন্তু আমার সংস্কৃত গ্রন্থগুলি আর পুস্তু ভাষায় লেখা ঐ দুখানি অমূল্য পাণ্ডুলিপি গেল—এ-দুঃখ যাবার নয়।

কিন্তু উপায় কি! চুপচাপ রইলুম।

সকালে ঘুম ভাঙতে সরকার দম্পতী এসে অভিবাদন করলেন। রাত্রে ভালো ঘুম হয়েছিল কিনা, কোনো অসুবিধা বোধ করেছি কি না....জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁদের কাছে দুর্দ্দশার কথা বললুম না.... বললুম—না,কোনো অসুবিধা হয়নি।

তার পর মুখ হাত ধুয়ে বেলা আটটার সময় তাঁদের বাঙলো ছেড়ে আমি বেরুলুম। তাঁরা ছাড়তে চান না....বোঝালুম—তীর্থে যাবো.... পরে সুবিধা হলে নিশ্চয় এসে আবার আপনাদের আতিথ্য গ্রহণ করবো।

বাঙলো ছেড়ে পথে তো বেরুলুম....একটি পয়সা সম্বল নেই। মনে হলো, খাবো কি? কারো বাড়ীতে চড়াও হয়ে আতিথ্য নেবো.... তাতে আমার ছিল মনের বিরাগ—অনর্থক গৃহস্থকে বিব্রত করা। আমার সাধুর বেশ দেখে বিমুখ কেউ করবেন না জানি, তবু তাতে আমার বিরাগ।

চলতে লাগলুম কুরুক্ষেত্রের দিকে। এক বস্ত্র....সঙ্গে একখানা কম্বল ছিল, সেটাও চুরি গিয়েছে। অবস্থা খুবই খারাপ।

কুরুক্ষেত্রে তীর্থদর্শন, পূজাদি সেরে বৈকালে চারটের সময় প্রকাণ্ড হ্রদের তীরে একা আমি চলেছি····ভাবছি, পেটে কি দেবো····তাছাড়া ট্রেনের ভাড়া ইত্যাদি····ভাবছি, ভগবান কি উদ্দেশ্যে তুমি আমাকে এমন অসহায় নিঃসম্বল করলে! এমন সময় দেখি, ওদিক থেকে একজন য়ুরোপীয়ান ভদ্রলোক এবং তাঁর স্ত্রী আসচেন আমার দিকে···· তাঁদের পিছনে একজন বেয়ারা।

তাঁরা এলেন আমার কাছে····এসে নিজে থেকে পরিচয় দিলেন, য়ুরোপীয়ান পর্য্যটক বলে। ভারতের শাস্ত্রপুরাণ, ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য ভারতভ্রমণে এসেছেন। আমার সঙ্গে ভারতীয় দর্শন, ধর্ম্মতত্ত্ব নিয়ে তাঁরা আলোচনা করলেন। মনে হলো, আলোচনায় তাঁরা খুশী হয়েছেন। তার পর বিদায় নেবো····মহিলাটি দুখানি দশটাকার নোট দিলেন আমার হাতে। বললেন—সাধুসন্ন্যাসীদের তিনি তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন এইভাবে। মিনতি জানালেন, আমাকে ও-টাকা নিতেই হবে।

ভগবানের দান! নিঃসম্বল আমি····তিনিই এ-টাকা দিলেন। ভগবানের দান বলেই এ-টাকা আমি নিয়ে শিরোধার্য্য করলুম।

তাঁরা বললেন—খুব শক্তিমান-কোনো সাধু-যোগীর সন্ধান দিতে পারেন····যিনি আমাদের প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পারবেন?

আমি বললুম—এখনি পারি না····একটু ভেবে বলবো।

তাঁরা বললেন—কোথায় দেখা হতে পারে আপনার সঙ্গে? আমরা এখানকার ডাক বাঙলোয় যাবো এখন।

আমি বললুম—পরের দিন বেলা তিনটের আমি যাবো ডাক

বাঙলোয়....গিয়ে দেখা করবো।

পরের দিন কুরুক্ষেত্রের পোষ্টমাষ্টার এবং তহশীলদারের কাছে সন্ধান নিয়ে জানলুম, কুরুক্ষেত্রে আছেন এক সাধু-যোগী....ওঙ্কার দেও বাবা....তাঁর অসাধারণ অলৌকিক শক্তি! অনেকে তাঁর এ-অলৌকিক শক্তির পরিচয় প্রত্যক্ষ করেছেন। ইনি আগুনের উপর দিয়ে হেঁটে চলেন....সরবতের সঙ্গে সাপের বিষ মিশিয়ে পান করেন। বন্ধ সিন্দুকের মধ্যে সাতদিন অনাহারে কাটিয়েছেন একবার....সকলে প্রত্যক্ষ করেছে। কুরুক্ষেত্র সহরের প্রান্তে ঝোপঝাড় এবং প্রান্তর....সেইখানে একখানি পর্ণকুটীরে তিনি থাকেন। অবারিত দ্বার....রাজা-মহারাজা থেকে দীন দুঃখী ভিখারী সকলকে তিনি সমান দেখেন।

এ-কথা শুনে আমি চললুম সাধু-দর্শনে। গিয়ে দেখি, চালাঘর.... তার সামনে বড় একটা গাছের উঁচু ডালে দুপা দড়িতে বাঁধা....মাথা নীচের দিকে....ঝুলচেন যোগী। বুঝলুম, সাধনা করছেন। আমাকে দেখে যোগী তখনি দড়ির বাঁধন খুলে ঐ উঁচু ডাল থেকে ঝাঁপ খেয়ে মাটীতে নামলেন। যেটুকু দেখলুম....বুঝলুম, ইনিই বাবা ওঙ্কার দেও।

নেমেই তিনি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন...ভাই বলে করলেন আমাকে সম্বোধন। বললেন—তোমার দয়া....তাই আমাকে দর্শন দিতে এসেছো। তার পর বললেন—আমার সঙ্গে এসো....তুমি দুদিন অভুক্ত আছো....শুধু জলপান করেছো। ক্ষুধার্ত্ত....এসো।

আমি অবাক। ভক্তিতে আমার মন পরিপূর্ণ হলো। চললুম তাঁর সঙ্গে তাঁর চালাঘরে।

তিনি দিলেন আমার হাতে ফল....দিলেন মিষ্টান্ন। বললেন—

তোমার গ্রন্থগুলি এবং সর্ব্বস্ব কি করে গেল ?

বললুম তাঁকে থানেশ্বরের বাঙলোয় চুরির বিবরণ। শুনে তিনি বললেন—কুরুক্ষেত্র থেকে কোথায় যাবে ?

বললুম—ফিরোজাবাদ....আগ্রা জেলায়।

হেসে তিনি বললেন—সম্পূর্ণ অজানা একটি লোকের হাত থেকে তোমার চুরি যাওয়া জিনিষ পাবে। তাঁর কাজ হলো চোরাই জিনিষ ....জিনিষের মালিকের হাতে পৌঁছে দেওয়া।

তাঁর এ-কথার অর্থ তখন বুঝিনি....তবু এ নিয়ে তাঁকে কোনো প্রশ্ন করলুম না। তবে মনে হলো, ইনি যখন এ-কথা বললেন....দেখা যাক, কি হয়! অর্থাৎ জিনিষগুলির সম্বন্ধে একেবারে হতাশ হলুম না।

যোগীকে সেই সাহেব মেমের কথা বলেছিলুম....তিনি বলেছিলেন —পরের দিন তিনি ডাক বাঙলোয় গিয়ে সাহেব মেমের সঙ্গে দেখা করবেন।

পরের দিন বেলা সাড়ে তিনটে....যোগীকে নিয়ে আমি ডাক বাঙলোয় গেলুম। সাহেব-মেম তাঁকে প্রণাম করে ভক্তিভরে অভ্যর্থনা করে বসালেন। মেমসাহেব বললেন—আমি আমেরিকান...আমার স্বামী ইংরেজ। আমার বাবা থাকেন আমেরিকায়....তিনি লক্ষপতি। আমেরিকা থেকে দিল্লীতে আমার ঠিকানায় টেলিগ্রাম এসেছিল.... সে-টেলিগ্রাম সেখানকার পোষ্টমাষ্টার রীডাইরেক্ট করে এখানে আমার কাছে পাঠিয়েছেন। তাতে খবর—আমার বাবার খুব অসুখ.... প্রাণের আশা নেই। আমি জানতে চাই, তিনি এ-যাত্রা বাঁচবেন কি না। আরো জানতে চাই, আমি ইংরেজকে বিয়ে করেছি বলে তিনি

রাগে আমার সঙ্গে সম্পর্ক কেটে দিয়েছেন। আমার মা মারা গিয়েছেন এগারো বছর আগে। আমি মা-বাপের এক সন্তান....আমার আর ভাই-বোন নেই....কাজেই আমি তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকারী। আমার বাবা মারা গেলে তাঁর বিপুল সম্পত্তির কি হবে? আমি পাবো? না, তিনি আমাকে বঞ্চিত করে আর কাকেও দিয়ে যাবেন?

যোগী বললেন—আমাকে সময় দিতে হবে। আলাদা ঘর দাও... জানবার জন্য।

তিনি জেনে নিলেন বাপের নাম এবং ঠিকানা।

ডাক বাঙলোয় একখানি ঘর নেওয়া হলো....যোগী ঢুকলেন সেই ঘরে....ঘরে গিয়ে তিনি ঘরের দরজা ভিতর দিকে বন্ধ করলেন।

এঁরা তিনজনে বাহিরে বসে নানা কথা, নানা আলোচনা। যোগী বেরুলেন ঘর থেকে চার ঘণ্টা পরেল বললেন—হ্যাঁ....আপনার বাবার সাংঘাতিক অসুখ....আর দুদিন তাঁর প্রাণ। তিন দিন কাটবে না— মৃত্যু। আপনার এক বান্ধবী মিস জেমিশন....তিনি ছিলেন ঘরে...তিনি আমার সঙ্গে আপনার বাবার পরিচয় করিয়ে দিলেন। আপনার বাবার কথা কইবার শক্তি নেই....তবে জ্ঞান আছে....কথা বলতে পারলেন না। বাপের বাড়ী দোতলা....ফটক পথের উপর....ফটকে ঢুকেই এক ইতালীয়ান শিল্পীর তৈরী মর্ম্মর মূর্ত্তি আছে....মূর্ত্তিটি মোজেইক পাথরের তৈরী। হলঘর এবং হলের কোণের ঘরে এক জেসুইটের কটি ছেলেমেয়ে আছে। বাড়ীতে অনেক রকমের চমৎকার পাখী দেখলুম.... পোষা পাখী। বাপ উইল করে তাঁর সম্পত্তি দিয়েছেন....তাঁর একটি উপপত্নী আছে....সেই উপপত্নীর ছেলেকে। তবে এ নিয়ে মামলা

মকর্দ্দমা হবে সেখানকার কোর্টে।

এর পর পায়ে হেঁটে আমি চললুম ফিরোজাবাদ....পনেরো দিনের দিন ফিরোজাবাদে পৌঁছুলুম। সাহেব এবং তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে বেশ আলাপ হলো....তাঁরা বললেন, চিঠিপত্র লিখে যেন যোগাযোগ রাখি। এ-কথা রক্ষা করেছি....তাঁদের সঙ্গে বহুকাল চিঠিপত্র লেখালেখি চলেছিল। যোগী যে-যে কথা বলেছিলেন....তাঁরা লিখে জানিয়েছিলেন, সব সত্য হয়েছে....সম্পত্তির জন্য মেমসাহেব সেখানকার কোর্টে মকর্দ্দমা রুজু করেছিলেন।

মহাভারতী মহাশয় লিখেচেন—ফিরোজাবাদে আমি এস, এল-এর বাড়ী গিয়ে উঠলুম....তাঁর সঙ্গে কোনো পরিচয় ছিল না। ওখানে এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কাছে আমার কাজ ছিল....তিনি ফিরোজাবাদে ছিলেন না বলে আমি নিজে এই এস, এল-এর গৃহে গিয়ে আশ্রয় নিলুম। কিন্তু দু ঘণ্টার মধ্যে জানতে পারলুম, এস, এল হলো একদল ডাকাতের সর্দ্দার। তার দলের লোকজন রেলে এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ষ্টেশনের কাছাকাছি নানা সহরে চুরি ডাকাতি করে বেড়ায়। দলে প্রায় দুশো লোক। কিছুকাল আগে ওর বিরুদ্ধে আগ্রা কোর্টে ডাকাতির চার্জে কেশ চলেছিল....ও আর ওর দলের প্রায় বিশজন লোক ছিল আসামী। সে-মকর্দ্দমায় অনেক রাজা-মহারাজা, বেগম, নবাব, তালুকদার সাক্ষ্য দিয়েছিলেন....তাঁদের দামী বহু গহনা চুরি যায়....কতক উদ্ধার হয়েছিল ওর দলের কজনের কাছ থেকে। সে-মকর্দ্দমা এখনো চলেছে....ও আছে আপাততঃ জামিনে খালাশ।

কথাটা শুনে মন বিরূপ হয়েছিল....কিন্তু ওর গৃহত্যাগ করলুম না।

আমি শুধু একটা রাত্রি এ-বাড়ীতে থাকবো তো....কোথায় আবার যাবো! লোকটা যত্ন করছে....কাজেই অন্যত্র যাবার চেষ্টা করিনি।

দুপুর বেলায় এস, এল-এর এক বন্ধু এলো ওর কাছে....দুজনে একটা ঘরে গিয়ে গোপনে কি সব কথাবার্ত্তা হলো। আমি আমার ঘরে টেবিলের ধারে বসে চিঠি লিখছি....হঠাৎ আমার পিঠে কে মারলো লাঠির টোকা। পিছন দিকে একটা জানলা....ফিরে সেদিকে তাকাতেই দেখি, মানুষ নেই আমার পিছনে....এ-ঘরে....তবে জানলায় একটা প্রকাণ্ড ঝোলা....ক্যাম্বিসের ঝোলা....ময়লা এবং জীর্ণ ঝোলা। ঝোলাটা ঝুলন্ত অবস্থায় এবং ঝুলছে অস্বাভাবিক ভাবে। আমার হলো কৌতূহল....উঠে গিয়ে ঝোলাটা স্পর্শ করতেই ঝোলার গা ফেঁশে ঘরের মধ্যে পড়লো ঝুপঝুপ করে আমার সেই চুরি যাওয়া সংস্কৃত বইগুলি এবং সেই দুটি পুস্ত পাণ্ডুলিপি। আমি সেগুলি কুড়িয়ে নিলুম।

তার পর এস, এল ঘরে এলে তাকে বললুম আমার সে চুরির বৃত্তান্ত ....দেখালুম সেই চোরাই পাণ্ডুলিপি এবং সংস্কৃত বইগুলি। সে বললে —এ-সব তার জিনিষ....সে একজন হকারের কাছ থেকে কিনেছে। সেগুলো সে কেড়ে নিলে আমার হাত থেকে ...কিছুতেই দেবে না।

কথাটা মিথ্যা....বুঝলুম। এ-নিয়ে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা হলো পথে....তিনি বললেন—আপনি পুলিশে খবর দিন।

ভাবলুম, তা হয় না। যে-লোকটা আমাকে আশ্রয় দিয়েছে, আতিথ্যে পরিতৃপ্ত করেছে....যত অন্যায় সে করুক....তাকে পুলিশে ধরিয়ে দিলে সে-কাজ শুধু গর্হিত হবে না....অকৃতজ্ঞতার পাপ হবে।

কিন্তু বিধির এমন বিধান! আধ ঘণ্টা পরে এস, এল-এর বাড়ী

পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর সদলে এসে হাজির। অফিসার বললেন, এস, এল-এর বাড়ী আবার তিনি সার্চ করবেন....কোর্টের পরোয়ানা আছে। হায়দ্রাবাদের কোন্ বেগমের কতকগুলি জুয়েলারি আছে এ-বাড়ীতে লুকুনো....ট্রেনের কামরা থেকে এ-সব জুয়েলারি চুরি গিয়েছিল।

এস-এল ইতিমধ্যে আমার বইগুলি আর পাণ্ডুলিপি দুটি সরিয়ে দিতে তৎপরতা করছিল। পুলিশ আসতে সেগুলো সে তার গুপ্ত ভাণ্ডারে লুকোতে যাবে, ইন্‌স্পেক্টর তাকে গ্রেফতার করলেন বামাল সমেত। তিনি বললেন—এ-বাণ্ডিলে কি আছে? এস, এল বলতে পারলো না। আমি দিলুম ফিরিস্তি....সংস্কৃত গ্রন্থগুলির এবং পাণ্ডুলিপি দুটির নাম। বললুম—আমার সম্পত্তি·· থানেশ্বরের সরকার সাহেবের বাড়ী থেকে চুরি যায়।

এস, এল এবং তার দুজন লোককে তখনি তাঁরা গ্রেফতার করলেন। পুলিশকে তখনি এস, এল দিলে সাতটা সোনার মোহর....বললে—স্যার, আর তল্লাসী করবেন না....মোহর নিন সেলামি।

সার্চ আর হলো না। তবে আমার বইগুলি আমি পেলুম ফেরত ....ইন্‌স্পেক্টর দায়ে পড়ে এ-ব্যবস্থা করলেন—আমার সামনে সাত-সাতটা মোহর হলো পকেটস্থ....আমি পাছে ফাঁশ করি। আমি কোনো কথা বললুম না···বইগুলি পেয়ে ভাবলুম, ওঙ্কার দেও বাবার কথা কি করে ফললো! তিনি বলেছিলেন, এগুলো পাবো অজানা লোকের কাছ থেকে এবং সে-লোকের কাজ হলো....চোরাই মাল উদ্ধার করে মালিকের হাতে তুলে দেওয়া। পুলিশের তো তাই হলো কাজ। তবে টাকাকড়ি যা গিয়েছে, তার একটা পাই-পয়সা পেলুম না।

সতেরো

মন্ত্রশক্তি

আমরা এ-যুগের মানুষ....মন্ত্রতন্ত্রে বিশ্বাস করি না। পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে আমি নিজে প্রত্যক্ষ করেছি, ছোট ছেলেমেয়েদের জ্বর পেটের অসুখ সর্দ্দি-কাসি বা শারীরিক নানা উপসর্গে আমাদের মা-দিদিমারা 'মন্ত্র-পড়া'র ব্যবস্থা করাতেন। কজন এমন লোক ছিলেন.... যাঁরা মন্ত্র জানতেন....সেই মন্ত্র পড়ে দিতেন পাত্রভরা জলে....সেই জলপড়া খাওয়ালে দেখেছি, ছেলেমেয়েরা সুস্থ হতো। বাতে দেখেছি, অনেকে মন্ত্র-তন্ত্রের ব্যবস্থা করে আরাম পেতেন....স্বাচ্ছন্দ্য পেতেন। যাঁরা মন্ত্রতন্ত্র পড়তেন, তাঁদের পয়সার লালস দেখিনি.... মন্ত্রতন্ত্র পড়ে তাঁরা নিঃস্বার্থভাবেই পরের হিতসাধন করতেন।

মন্ত্রতন্ত্রের গুণের একটি কাহিনী পড়েছি Hindu Spiritual Magazine পত্রিকার ১৯১১ সালের অক্টোবর সংখ্যায়। যাঁর বাড়ীর ব্যাপার, তিনি পাবনার কৃতী উকিল মানুষ....মিথ্যা করে একটা কাহিনী ছাপাবার মানুষ তিনি নন—এ-কথা সকলেই স্বীকার করবেন।

তাঁর বিবৃত কাহিনীর মর্ম্ম :—

তিনি লিখেছেন—১৯০৫।০৬ সালে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র আম গাছে উঠেছিল আম পাড়তে....অবশ্য সঙ্গে ছিল কজন সহচর। এ-গাছে উঠছে নামছে, আবার ও-গাছে উঠছে নামছে....এমনিভাবে চলেছিল তাদের আম পাড়বার ধুম। সন্ধ্যা হলে ছেলে বাড়ী ফিরলো....

জ্বর জ্বর ভাব····রাত্রে বেশ হাই টেম্পারেচার। সারা রাত ছটফটানি, চোখে ঘুম নেই····অতি দুর্ভাবনায় রাত কাটলো। সকালে ডাক্তার আনা হলো····দেখে শুনে ডাক্তার ওষুধ দিলেন····কিন্তু ছেলের অস্থিরতা যায় না। একটু বেলা হতে ছেলের সারা পিঠ জুড়ে বিড়বিড়ে ঘামাচির মতো ফুস্কুরি····গায়ে ভীষণ জ্বালা। ডাক্তার দেখে বললেন, একজিমা। তার ঔষধ দিলেন····একদিন পরে সেগুলো ফেটে গলে দগদগে ঘা পিঠ জুড়ে। জ্বরও বেশী····এমন অবস্থা যে ছেলে শুতে পারে না চিৎ হয়ে—উপুড় হয়ে বিছানায় পড়ে থাকে। মলম দিলেন ডাক্তার····সে-মলমে সারা দূরের কথা, ঘা বয়ে পুঁজ-রক্ত। ভয় হলো, পিঠ পচে ছেলে মারা যাবে বুঝি!

বিখ্যাত এ্যাসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন রায় বাহাদুর নবীন চক্রবর্ত্তীকে আনা হলো····দেখে তিনি বললেন—অত্যন্ত সাংঘাতিক টাইপের একজিমা! তিনিও ঔষধাদি দিতে লাগলেন····দশ-বারো দিন কাটলো····রোগের উপশম হওয়া দূরের কথা, ঘা ছড়িয়ে পড়তে লাগলো—বুকেও দু-চারটে ফুস্কুড়ি দেখা দিল। অনেকে পরামর্শ দিলেন—কলকাতায় নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করান (ছেলের বাপ থাকতেন পাবনায়)।

কলকাতায় যাবার আয়োজন হলো····তখন পাড়ার কে একজন বললেন—এখানে আছে বোদু কলু····সে ঘা-পাঁচড়া সারাতে পারে মন্ত্রের জোরে····কলকাতায় যাবার আগে তাকে একবার দেখানো হোক।

ছেলের বাপ তখন বোদু কলুকে আনালেন। লোকটির বেশ বয়স হয়েছে····খুব বৃদ্ধ। সে দেখলো রোগীকে····তাকে বলা হলো রোগীর নাম····বলা হলো, তাঁরা হদ্দমুদ্দ চেষ্টা করেছেন····রোগ কমা দূরের কথা,

বেড়ে এখন ঘা হয়েছে....দেখলে আতঙ্ক হয়।

দেখে শুনে বোদু বললে—পাঁচ দিন সময় লাগবে আরাম হতে। ভয় নেই, সারবে।

ছেলের পিঠে ডাক্তারী মলম...ব্যাণ্ডেজ জড়ানো। বোদু বললে ছেলের মাকে—ও-ন্যাকড়াগুলো খুলে দিন মা।

ব্যাণ্ডেজ খোলা হলো।

বোদু চাইলো খানিকটা সর্ষের তেল। ছেলের মাকে বললে—একটু গরম জল চাই মা।

সর্ষের তেল এলো, গরম জল এলো....তেলে-জলে মিশিয়ে বোদু পড়লো পাত্রে হাতচাপা দিয়ে মন্ত্র। কি মন্ত্র, তা কেউ বুঝলেন না.... বাঙলা না সংস্কৃত, তাও বোঝা গেল না। মন্ত্র পড়ার সময় নিষ্ঠা খুব—ধূপধুনার ব্যবস্থা, ফুল নিয়ে কার উদ্দেশে পূজা নিবেদন। তার পর বোদু বললে—এই মন্ত্রপড়া তেলে জলে মিশানো রইলো....ঘায়ের উপর এটাতে তুলো দিয়ে প্রলেপ দিন....তার উপরে কলাপাতা চাপা দিয়ে তার পর ফ্যাটা জড়াতে পারেন। পর পর আরো দুদিন আমি এসে মন্ত্র পড়বো ...আপনারা ফুল ধূপধুনার আয়োজন করে রাখবেন।

সেই ব্যবস্থাই হলো এবং ছেলের বাবা লিখেছেন—পরের দিন ঘায়ের চেহারা ফিরলো....তিনদিনে ঘা শুকোলো এবং পাঁচদিনের দিন ঘায়ের গা থেকে শুকনো খোশা বা ছাল ঝরে গেল....ছেলে সেরে উঠলো।

সারবার পর বোদু বললে—পাঁচ পয়সার পূজা দেবেন....গ্রামের অশথ তলায়। কোন অশথতলা, তার নির্দ্দেশ সে দিয়ে গেল।

মন্ত্রের জোরে দুরারোগ্য রোগ সারানো....তার বহু কাহিনী এখনো

লোকমুখে শুনি। কত মন্ত্র এবং এ-সব মন্ত্রের কি বিচিত্র শক্তি··· আমরা কজন তার কথা জানি!

মন্ত্রের জোরে বিজ্ঞানের এবং দেহতত্ত্বের সর্ব্ববিধি লঙ্ঘন করে কি অসাধ্য সাধন না যোগীঋষিরা করে গিয়েছেন! এ-কালেও মন্ত্রাদির বিশেষ শক্তি অনেকে দেখেছেন। মন্ত্রের অলৌকিক শক্তির জোরে সাধক জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের উপর পায়চারি করেছেন···তাঁর দেহে আগুনের আঁচ লাগেনি····তাঁর একটি কেশ বা পরণের ধুতি-চাদর পোড়েনি। এমনি একটি কাহিনী বলি :—

এ-কাহিনীটি প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্ব্বে 'ভারতী' মাসিক পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। সে-কাহিনীর মর্ম্ম সঙ্কলিত হলো :—

পঞ্চা--ষাট বছর পূর্ব্বে কাশীর সাধু শ্রীমদ জঙ্গমবাবা আগুনের উপর হেঁটে মন্ত্রশক্তির অলৌকিক পরিচয় দিয়েছিলেন। ঢাকায় ছিলেন সাধক তরণীকান্ত চক্রবর্ত্তী। অগ্নিকুণ্ডে তাঁর পাদচারণা দেখে বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় তখনকার আই-সি-এস ম্যাজিষ্ট্রেট নেলশন এবং চট্টগ্রামের ম্যাজিষ্ট্রেট আই-সি-এস সডে সাহেব লিখেছিলেন····নেলশন লিখেছিলেন—I went to see Sreejukta Tarani kanta chakravarti giving an exhibition of Jogi. He walked over burning wool through flames in a marvellous manner.

এই অনুষ্ঠানেই চট্টগ্রামের ম্যাজিষ্ট্রেট আই-সি-এস সডে ছিলেন উপস্থিত। তিনি লিখেছিলেন—I went to see Sreejukta Tarani kanta Chakravarti in Dacca and can certify that he walked over burning wood in a way that is to astonish any and

all spectators.

'ভারতী' পত্রিকায় চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অগ্নি-অনুষ্ঠানের যে-বিবরণ ছাপা হয়েছিল, সে-কাহিনী বলি। এ-কাহিনী লিখেছিলেন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট প্রাণকুমার ঘোষ। তিনি লিখেছেন—চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের গৃহ দক্ষিণ জায়গাদ্দিতে। তাঁর নিজের গৃহে ১৯০৯ সালের ৩রা জুলাই তিনি অগ্ন্যুৎসবের অনুষ্ঠান করেছিলেন। তাঁর আশ্রমে সকালে হবে অগ্নি-উৎসব।

তিনি লিখেছেন—অনেকের সঙ্গে আমিও সেখানে গিয়েছিলুম। গিয়ে দেখি, বাড়ী লোকারণ্য....পথে কত ভিড়। চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমাদের সমাদরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বহু শিষ্য.... দেখলুম, সকলে আয়োজনে ব্যস্ত।

বাড়ীর প্রশস্ত প্রাঙ্গণে বিরাট চোবাচ্চা খোঁড়া হয়েছে—আট হাত লম্বা, আট হাত চওড়া, আধ হাত গভীর....তার মধ্যে দু মণ কাঠ রাখা হয়েছে। আমরা যাবার পরে দেখি, কুণ্ডের কাঠে আগুন দেওয়া হলো...নেড়ে নেড়ে আগুন চালিয়ে কুণ্ডভরা সব কাঠ জ্বালানো হলো.... কুণ্ডের কাঠ সতেজে জ্বললো—একঘণ্টার মধ্যে কুণ্ড হলো আগুনের হ্রদ। এমন অসহ্য তাপ যে কুণ্ড থেকে ন-দশ হাত দূরে থাকা যায় না।

আগুন যখন দাউ দাউ জ্বলছে, তখন তরণী ঠাকুর-এলেন প্রাঙ্গণে ....পায়ে খড়ম নেই, পরণে গরদের ধুতি, কাঁধে গরদের উত্তরীয়। তিনি দু-পাঁচ মিনিট চুপ করে দাঁড়ালেন অগ্নিকুণ্ডের দিকে মুখ করে...তার পর কি সব মন্ত্র পড়তে পড়তে তিনি ঢুকলেন অগ্নিকুণ্ডে—স্নান করতে নদীতে নামলে মানুষের কোমর ভোর জল যেমন হয়, তাঁর কোমর ভোর তেমনি আগুন....জ্বলন্ত আগুন...দাউ দাউ জ্বলা আগুন। আমরা

সকলে শিউরে উঠেছি···তার পর যেন সব পাথরের মূর্ত্তি। সেই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে তিনি চারবার চক্র দিলেন—দক্ষিণ থেকে উত্তরে, তার পর উত্তর থেকে দক্ষিণে, তার পর পূব থেকে পশ্চিমে এবং পশ্চিম থেকে পূব দিকে। শিষ্যেরা সকলে সমস্বরে বলছে, হরিবোল····হরিবোল!

তার পর তরণী ঠাকুর বেরিয়ে এলেন অগ্নিকুণ্ড থেকে। তিনি এলেন অক্ষত দেহে····তাঁর ধুতি-চাদর বা মাথার একগাছি কেশও দগ্ধ হয়নি। তিনি বেরিয়ে এলে শিষ্যরা নিলেন তাঁর পায়ের ধূলা····পায়ের ধূলা নিয়ে শিষ্যরা এক-একজন করে অগ্নিকুণ্ডে ঢুকে পাদচারণা করলেন ···চার বার করে তরণী ঠাকুরের মতো। অগ্নিকুণ্ডে পাদচারণা করতে করতে তাঁরা····হাতে মুঠো ভরা কাগজের টুকরো ছিল, সেগুলো অগ্নিকুণ্ডে ফেলতে লাগলেন—কাগজের টুকরো চকিতে পুড়ে ছাই হচ্ছিল। তার পর শিষ্যরা বেরুলেন অগ্নিকুণ্ড থেকে।

ঠাকুর তখন সমবেত জন মণ্ডলীকে উদ্দেশ করে বললেন—কে চাও অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করতে····এসো আমার কাছে।

অনেকে এলেন তাঁর কাছে····তিনি এক-একজনকে স্পর্শ করেন আর বলেন—এবারে ঢোকো আগুনে। বহু লোক তাঁর স্পর্শ নিয়ে অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করলেন এবং তাঁরা সকলেই বেরুলেন অক্ষত দেহে ·· তাঁদের কারো বসন বা কেশাগ্র আগুনে পোড়েনি।

লেখক লিখেছেন—আমরাও কাগজ ফেলেছিলুম আগুনে অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করে····ফেলবামাত্র আগুনে জ্বলে কাগজ হলো ছাই।

মন্ত্রের কি এমন গুণ যার জন্য বিজ্ঞান এবং দেহতত্ত্বের বিধি গেল উলটে—এর ব্যাখ্যা মেলে না বুদ্ধিতে বা যুক্তিতে।

আঠারো

রোজার রোজনামচা

শিক্ষিত ভদ্রলোক....ত্রিপুরার চাঁদপুরে বাড়ী....ব্যবসা-বাণিজ্যে কৃতী পুরুষ। কিশোর বয়স থেকে তিনি করতেন পরলোক-তত্ত্বের অনুশীলন এবং ঘটনাচক্রে এক ফকিরের কাছে তিনি শেখেন মন্ত্র-তন্ত্র....ভূত নামাবার মন্ত্র, ভূত ছাড়াবার মন্ত্র এবং ভূত তাড়াবার বহু তান্ত্রিক প্রথা, ফকিরী প্রণালীও তিনি পরে শেখেন। শিখে বহু কেস-এ বহু ভূতগ্রস্ত স্ত্রী-পুরুষকে তিনি করেছেন সুস্থ সহজ মনের মানুষ। কটি কেস-এর কথা তিনি লিখে ছাপিয়েছিলেন। আমরা তাঁর রচনা থেকে কয়েকটি কাহিনী সঙ্কলিত করে দিলুম। কাহিনীগুলি পড়লে পরলোক এবং পরলোকগত বিদেহীর সম্বন্ধে বহু তথ্য জানতে পারবো।

১৯০৯ সালের জুন মাসে তিনি খবর পেলেন, তাঁর এক বন্ধুর স্ত্রীর ক মাস ধরে ঘন ঘন মূর্চ্ছা হচ্ছে....ডাক্তার কবিরাজের নানা ঔষধাদিতে কোনো ফল পাওয়া যাচ্ছে না। বন্ধু তাঁকে ধরলেন....বললেন—গ্যাখো তুমি....যদি কিছু করতে পারো।

ভদ্রলোকের নামের আদ্যাক্ষর সু। সু চললেন বন্ধুর গৃহে। গ্রামের বোনেদী পরিবার....মেয়েদের সম্বন্ধে অবরোধের কড়াকড় ব্যবস্থা। রোগী দেখে সু বুঝলেন, ভূতে পাওয়া ব্যাপার।

ফকিরের কাছে শেখা মন্ত্রতন্ত্র পড়ে তিনি রচনা করলেন কুণ্ডলী-চক্র ....রোগীর যাতনা হতে লাগলো। বুঝলেন, মন্ত্র ধরেছে। তিনি তখন

প্রশ্ন বর্ষণ করতে লাগলেন—তুমি কে? কেন এঁকে ভর করেছো? ইত্যাদি....কিন্তু রোগীর মুখে কথা ফোটে না। সু-ও ছাড়লেন না। কিন্তু দু ঘণ্টার কশরতিতেও রোগীর কণ্ঠে ভাষা নিঃসরণ হলো না।

সেদিনকার মতো হাল ছেড়ে সু বাড়ী ফিরলেন।

পরের দিন দুপুর বেলায় আবার সাধ্য-সাধনা....এদিনও কোনো কথা ফুটলো না রোগীর কণ্ঠে।

তিন দিনের দিন রোগীর কণ্ঠে ভাষা ফুটলো।

প্রশ্ন হলো—কে তুমি?

জবাব : আমি এর মা।

প্রশ্ন : মা হয়ে স্নেহমায়া ভুলে গিয়েছেন? কেন এঁকে কষ্ট দিচ্ছেন?

—কষ্ট দিইনি....তবে ওকে শিক্ষা দিতে চাই।

—আপনি কোথা থেকে আসছেন?

—পাবনা। যেখানে থাকতুম....যেখানে আমার মৃত্যু হয়েছিল।

—কিন্তু কি শিক্ষা দিতে চান? ওঁর অপরাধ?

—আমার কথা শোনে না....আমাকে মানে না কেন?

—কি কথা শোনেন নি? কেমন করে বুঝছেন, আপনাকে অমান্য করেছেন?

জবাব : হ্যাঁ....হ্যাঁ। আমি কত দিন রাত্রে স্বপ্নে ওকে বলেছি ....জামাইকে বলেছি, মন্ত্র নাও। জামাই না নিক....মেয়ে নিক মন্ত্র। তা গ্রাহ্য নেই। বিশ্বাস করে না গো....ম্লেচ্ছ হয়েছে, সাহেব হয়েছে....দু পাতা ইংরেজী পড়ে। আমি মেয়ের মঙ্গল চাই....তাই বার বার স্বপ্নে

দেখা দিয়ে মন্ত্র নিতে বলি···তা গ্রাহ্য করে না। সামনে ২রা শ্রাবণ···· ভালো দিন····মন্ত্র নিতে বলো মেয়েকে—কারো কাছে···গুরুর নাম বলে দিচ্ছি।

এক পণ্ডিতের নাম বললেন স্পিরিট।

প্রশ্ন: কিন্তু আপনি যে এঁর মা····তা বিশ্বাস করবো কেন? আপনি বলুন তো সব পরিচয়।

তখন রোগীর কণ্ঠে রোগীর বাপের বাড়ীর লোকজনের নাম, মামার বাড়ীর লোকজনের নাম, এবং পারিবারিক বহু অতীত ঘটনার বিবরণ শোনা গেল। বিবরণ সঠিক····কোথাও এতটুকু ভুল নেই।

তার পর ক্ষণেক নীরব থেকে রোগী বললেন—আমার মৃত্যুর পর সৎকারের জন্য আমার দেহ নিয়ে যারা শ্মশানে যায়, তাদের মধ্যে দুজন ছিল অব্রাহ্মণ····সেজন্য অশুচি-দোষ ঘটে····তাই আমার ঊর্দ্ধগতি হয়নি ····সেজন্য আমার অশান্তি আর দুর্ভোগ চলেছে সমানে। তাছাড়া আমার শ্রাদ্ধও বিহিতভাবে সম্পাদিত হয়নি।

এই পর্য্যন্ত বলার পর রোগীর দু চোখে ঝরলো জলধারা। নিশ্বাস ফেলে তিনি বলতে লাগলেন—স্বপ্নে মেয়েকে কতবার বলেছি, গয়ায় আমার উদ্দেশে একটা পিণ্ড দিয়ে আয়। তা মেয়ে ছুটীছাটায় হাওয়া খেতে এখানে-ওখানে যাচ্ছে····মাকে দায়মুক্ত করতে গয়ায় যাবার নাম করে না। মরা মাকে কোনো দিন এক গণ্ডূষ জল পর্য্যন্ত দেয় না। গয়ায় আমার পিণ্ড দিক—আমি ওকে ছেড়ে চলে যাবো।

—কোথায় যাবেন?

—পাবনায়।

—সেখানে কারো উপর ভর করবেন তো ?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা....মানুষজনকে কেন কষ্ট দেন ?

—মানুষকে ভর করলে দুঃখ-যাতনা ভুলে থাকি।

—পাবনা ছেড়ে এখানে এসেছেন কত দিন ?

—তা প্রায় দু বছর।

রোগীর হিষ্টিরিয়া উপসর্গ ঘটছে দু বছর।

পিণ্ডদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলো....তখন রোগী বললেন—বেশ, যাবো....তবে পিণ্ড না দেওয়া অবধি মাঝে মাঝে আসবো। আমার পিণ্ড দেবার পর মেয়ে যেন মন্ত্র নেয়....নাহলে মঙ্গল হবে না।

সে-আশ্বাসও দেওয়া হলো এবং এর পর স্বামীর সঙ্গে গয়ায় গিয়ে রোগী দিলেন মায়ের উদ্দেশে পিণ্ড। তার পর থেকে তাঁর আর ফিট হয়নি।

১৯০৮ সালের ১৫ই জুলাই :—

ক-র স্ত্রী নানা রোগে ক মাস ভুগছেন....চিকিৎসায় ফল হচ্ছে না ....সকলে সাব্যস্ত করলেন, এ হলো ভূতে পাওয়া কেস। তখন সু-কে তাঁরা নিয়ে গেলেন।

এখানে তান্ত্রিক প্রণালীতে চিকিৎসার ব্যবস্থা। রোগীর কণ্ঠে নানা আবোল-তাবোল কথা....কথার অন্ত ছিল না....সে-সব কথা থেকে কতকগুলি বেছে সঙ্কলিত করছি।

রোগীর ফিট হয়....ফিটের উপসর্গ চলেছিল এক বছর আগে....তার

পর এক তান্ত্রিক এনে তাঁকে দিয়ে ভজন-পূজন যাগ-যজ্ঞ করা হয়.... তান্ত্রিক একটি মাদুলি দিয়ে যান—সে-মাদুলি গলায় ধারণ করে থাকতে হবে সারা জীবন....এই ছিল তান্ত্রিকের নির্দেশ। রোগীর গলায় সে-মাদুলি এখনো আছে....তবু দু-তিন মাস ধরে আবার সেই ফিটের উপসর্গ।

তন্ত্রমন্ত্রের জোরে স্থ পেলেন স্পিরিটকে···প্রশ্ন করলেন—গলায় মাদুলি রয়েছে....তবু তুমি ভর করলে কি করে ?

জবাব : মাদুলি অশুচি হয়েছিল....তাই।

প্রশ্ন : কি করে অশুচি হলো ?

জবাব : ওঁর ননদ রজস্বলা-অবস্থায় সে-মাদুলি স্পর্শ করেছিল।

—সে মাদুলি আবার পরিশুদ্ধ করা যায় না ?

—যায়। পুরুত ডাকিয়ে ব্যবস্থা করো।

স্থ বললেন—বেশ....তাই করতে হবে। তুমি যাবে তো ?

জবাব : না। এর শরীরে নানা রোগ....আমি আছি বলে সে-রোগগুলো মাথা চাড়া দিতে পারছে না। আমি গেলে সে-সব রোগ এমন বাড়বে যে প্রাণসংশয় হতে পারে।

[কথাটা সত্য—রোগীর হৃদ্রোগ এবং Uterine গোলযোগ ছিল।]

প্রশ্ন : সে-সব রোগ সারবে না ?

জবাব : ইহজন্মে নয়।

—এঁর পরমায়ু কতকাল ?

—আর তিন বছর।

—বাঁচাতে পারো না?

—মায়ের ইচ্ছা তা নয়।

তার পর রোগী আপনা থেকে নানা অবান্তর কথা বলতে লাগলো। বাড়ীতে মেয়ে-পুরুষ ছেলে বুড়ো বহু লোকের ভিড়....হঠাৎ বললে—এর স্বামী (রোগীর স্বামী) আর এ বার বার সাতজন্ম ধরে জন্ম নিয়েছে....আর সাত-সাতবারই দুজনে স্বামী-স্ত্রী হয়ে বাস করছে।

প্রশ্ন: আগের জন্মে এঁদের কি জাত ছিল?

জবাব: ব্রাহ্মণ। এ জন্মের ঠিক আগের জন্মে স্বামী সন্ন্যাসী হয়ে সংসার ত্যাগ করে গিয়েছিল।

প্রশ্ন: তাই যদি, তাহলে উর্দ্ধগতি না হয়ে আবার এসে জন্মানো কেন?

জবাব: জন্মাবে না! মেয়েজাতের উপর লোভ ষোল আনা। সন্ন্যাসী হয়েও সে-লোভ ছাড়তে পারেনি।

এ-কথার মধ্যে....ভিড়ে ছিল একটি স্কুলের ছাত্র....বছর ১৪।১৫ বয়স....সে হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলো—আগের জন্মে আমি কে ছিলুম, বলো তো?

রোগী তার দিকে ক্ষণকাল স্থির নেত্রে চেয়ে রইলো....তার পর রোগীর চোখ হলো বাষ্পার্দ্র....কণ্ঠ হলো গাঢ়....রোগী বললে—আর জন্মে আমার পেটের ছেলে ছিলে। তোমার নাম ছিল নিবারণ।

এ-কথা বলে রোগী খাড়া হয়ে দাঁড়ালেন এবং ছেলেটির কাছে এসে তাকে জড়িয়ে ধরলো....ধরে সাশ্রু নয়নে বললে—তোমার বড় কঠিন রোগের ভয় আছে, বাবা। আজ রাত্রে স্বপ্নে তুমি একটা শিকড়

পাবে....আমি দিয়ে যাবো....কাল সকালে স্নান করে সেই শিকড়টি তোমার মাদুলিতে ভরে ডান হাতে বাঁধবে....লাল সুতো দিয়ে। খুব শুদ্ধাচারে সে-মাদুলি রাখতে হবে। যত কাল বাঁচবে, মাদুলিটি যত্নে রেখো....শরীর সুস্থ হবে...জীবনে দুঃখ পাবে না।

[আশ্চর্য্য কথা—সেদিন রাত্রে ছেলেটি স্বপ্নে পেয়েছিল একটি শিকড় এবং সকালে উঠে স্নান করে স্পিরিটের নির্দ্দেশ মেনে তামার মাদুলিতে শিকড়টি ভরে হাতে সে-মাদুলি বেঁধেছিল।]

সু-র বহু মিনতিতে রোগীকে সে ত্যাগ করে যায়। তাকে বলা হয়েছিল রোগীর অন্য রোগগুলি সারাবার ব্যবস্থা করতে....তার জবাবে সে বলেছিল—রোজ সকালে স্নান করে একশো আটবার মায়ের নাম জপ করে যেন শুদ্ধাচারে....তাতে যাতনা কিছু কমবে, কিন্তু পরমায়ু.........

স্পিরিট বলে গেল—মায়ের ইচ্ছা নয়....তিন বছরের বেশী কে একে এ-পৃথিবীতে ধরে রাখবে!

এ-রোগীর তার পর কি হলো....রোজনামচায় সে-কথা পাইনি।

উনিশ

ডাক্তারের ডায়েরী থেকে

হিষ্টিরিয়া এবং উন্মাদ-ব্যাধিকে পাশ্চাত্য বহু চিকিৎসক 'ভূতে-পাওয়া' বা obsession বলে গ্রাহ্য করেছেন....গ্রাহ্য করার মূলে বহু পরীক্ষা এবং এ-পরীক্ষায় তাঁরা সুফল পেয়েছেন প্রায় সকল ক্ষেত্রে।

পাশ্চাত্য প্রদেশে magnetic healer বলে এক শ্রেণীর সুধী বিজ্ঞানী চিকিৎসক বিশেষ শ্রদ্ধা, সম্মান এবং গণবিশ্বাস লাভ করেছেন। এদেশেও দু-চারজন বাঙালী চিকিৎসকের কথা জানি, যাঁরা hypnotic শক্তির প্রভাবে এবং magnetic প্রথায় চিকিৎসা করে আশ্চর্য্য সাফল্য এবং বিশিষ্ট খ্যাতিলাভ করেছিলেন। এখন তেমন চিকিৎসক এদেশে কেউ আছেন কি না জানি না....তবে এ বিষয়ে পরলোকগত ডাক্তার গিরীন্দ্রশেখর বসুকে বহু ক্ষেত্রে এ প্রণালীতে চিকিৎসা করে সাফল্যলাভ করতে দেখেছিলুম।

পাশ্চাত্য দেশের প্রখ্যাত magnetic চিকিৎসক ডেনিয়েল হান, এম-এফ (Magnetic Healer) সেখানকার Progressine Thinker পত্রিকায় তাঁর কটি কেস-এর যে বিবরণ প্রকাশ করেছেন, সেগুলি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

তিনি লিখেছেন—প্রথম যে কেস-এ obsession বা ভূতে পাওয়ার ব্যাপার বোঝেন, সে সম্বন্ধে বলেন, Magnetic Healer হিসাবে তিনি রোগী দেখতে গিয়েছিলেন....তার পর নানা লক্ষণ দেখে এবং নানা

নির্দ্দেশের পর তিনি বুঝেছিলেন, ভূতে পাওয়া ব্যাধি। তার পর বহু কেস-এ তিনি এই ব্যাধি নির্ণয় করেন....করে আশ্চর্য্য ফললাভ করেন। তিনি বলেন—magnetic চিকিৎসা-রীতিতে স্পিরিচুয়ালিজ্‌ম্‌ আছে এবং তিনি একজন স্পিরিচুয়ালিষ্টও বটে। কি করে নির্ণয় করেন....সে সম্বন্ধে বিশেষ কোনো বিধিনিয়ম নেই—I know of us exact rule.... each case manifesting differently and varying as much as the people obsessing many in character and disposition. জোর জবরদস্তি করে কোনো কেস-এ তিনি ভূত তাড়াননি....সে-প্রণালীতে তাঁর আস্থা নেই মোটে। জোর জবরদস্তি তাঁর ধাতেও আসে না। তিনি লিখেছেন—The most of the obsessing spirits with whom I have had experiences have been poor unfortunates while in life more sinnest against and wronged than sinning.

তাঁর প্রথম case-টি এই :—ক' বছর আগে টাসকোমায় এক স্ত্রী-রোগী ছিল আমার চিকিৎসায়....তার উপর ভর হয়েছিল এক sailor boy-এর ভূত (spirit)। রোগীর বয়স কম....মা-বাপের বয়স হয়েছে....মা-বাপ ছাড়া জগতে তার কেউ নেই। মা-বাপ মারা গেলে বেচারীর কি দশা হবে, এই ভেবে আমি তাকে ভূত-ব্যাধি থেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করছিলুম....কিন্তু তার মা-বাপ এবং মা-বাপের আত্মীয়-বন্ধুরা আমার কথা বিশ্বাস করেন নি...তাঁরা মেয়েটির চিকিৎসার অন্য ব্যবস্থা করলেন; কাজেই এ কেস-এ আমি পরীক্ষা করতে পারিনি।

তার পর গত মে মাসে (১৯১৩) একটি কেস পেলুম। রোগী স্ত্রীলোক....থেকে থেকে তাঁর ভয়ানক মাথা ধরে ...অসম্ভব মাথায় যাতনা। দু বছর ধরে এ-ব্যাধি চলেছে....বহু চিকিৎসাতেও রোগ নির্ণয় হয় না এবং তিনি আরোগ্য লাভ করেন না। তখন আমার চিকিৎসাধীনে তাঁকে রাখা হলো। মাথা ব্যথার, মাথা ধরার সময় তাঁকে মনে হয় যেন মন্ত্র-চালিতের মতো....তিনি স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো অনেক কিছু দেখছেন.... কোথায় কোথায় চলেছেন....এমনি যা-তা কথা বলেন। একদিন বিছানায় শুয়ে থেকেই তিনি বলে উঠলেন—উঠানে পড়ে গিয়েছি.... আমাকে তোলো। এমনি তিনি নানা 'খেয়াল দেখেন'।

ডাক্তার লিখেছেন—যেদিন প্রথম তাঁকে দেখতে গেলুম....যেমন আমি রোগীর ঘরে প্রবেশ করেছি....মাথার যাতনায় রোগী বিছানায় পড়েছিলেন মূর্চ্ছাহতের মতো....যেমন আমি তাঁর ঘরে ঢুকেছি....তার চোখ ছিল মুদ্রিত, তিনি আমাকে চোখে দেখেন নি....তবু চীৎকার করে উঠলেন—আমি যাবো, যাবো, নিশ্চয় যাবো। এবং এমনি ধরণের কথা। একথা শুনে এবং রোগীর আচ্ছন্ন ভাব দেখে তখনি আমি বুঝলুম, ভূতে পাওয়া রোগী। তার পর বিছানার চাদর ধরে টানাটানি এবং হাত-পা ছুড়ে এমন মাতন সুরু হলো যে বাড়ীর একজন স্ত্রীলোক এবং দুজন জোয়ান পুরুষ মিলে তাঁকে ধরে রাখতে পারেন না। তিনি বিছানা ছেড়ে উঠবেনই....মুখে কেবল ঐ কথা—আমি যাবো....যাচ্ছি.... এখনি আমি চলে যাচ্ছি ইত্যাদি।

আমি হাত দিয়ে তাঁকে জাপটে ধরলুম....বললুম—হ্যাঁ যাবে....তুমি যাবে....আমিও তোমার সঙ্গে যাবো....আমরা সকলেই তোমার সঙ্গে

যাবো....বাড়ীর দোরে মোটর এসেছে....সব গোছগাছ করে নিয়ে এখনি আমরা বেরিয়ে যাবো।

একথা বলতে রোগী শান্ত হলেন....চোখ চাইলেন....চোখ চেয়ে তিনি আমার পানে চাইলেন। তখন বেশ স্নেহভরা কণ্ঠে আমি বললুম ....রোগীর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে দরদ ভরে বললুম—শোনো স্পিরিট, আমি দেখছি, এখানে তুমি অত্যন্ত দুঃখে আছো....এ-রোগীকে ছেড়ে তুমি যদি আমার কথায় আমার সঙ্গে আসতে পারো, তাহলে তোমাকে আমি এমন আনন্দ দেবো....যা তুমি ভাবতে পারো না। তুমি এ-রোগীকে ভর করবামাত্র এ-রোগী যে রকম করেন, যে যাতনা পান....তুমিও তো তাঁর সঙ্গে সে যাতনা ভোগ করো। তুমি আরামে থাকবে বলে তো এঁর দেহে ভর করেছো ...তা আরাম পাচ্ছো না তো। এখানে you are mistreated. তাছাড়া যতকাল বেঁচেছিলে, through all your life you were teribly wronged: এঁকে ছেড়ে চলে যাও....অন্যত্র চলো....আরামে থাকবে। এঁকে ত্যাগ করে যাও ....ইনি ঘুমোন, সুস্থ হোন। দুজনের যাতনা যাবে।

এমনিভাবে নানা স্তোকবাক্য....তার পর রোগীকে 'পাশ' দিলুম এবং আশ্চর্য্য, রোগী শান্ত হয়ে ঘুমোলেন। তার পর তাঁর এসব উপসর্গ আর হয়নি আজ পর্য্যন্ত।

দ্বিতীয় কেস—মহিলা রোগী....দেড় বছর ধরে তিনি ভুগছেন সব অঙ্গে পক্ষাঘাত হয়ে। এ রোগীকে দেখবার জন্য আমার আহ্বান এলো। এখানেও রোগীর গৃহে আমি যাবামাত্র রোগীর চীৎকার—না, যাবো না, যাবো না ইত্যাদি।

গিয়ে রোগী দেখলুম....রোগীর ইতিহাস শুনলুম। যে সব ডাক্তার দেখছিলেন, তাঁরা বলেন—Neuralgia....সেই রোগের তাঁরা চিকিৎসা করেছেন বরাবর। ইতিহাস শুনে এবং তাঁকে দেখে আমি বুঝলুম, Neuralgia নয়....ভূতে পাওয়া। 'পাশ' দিয়ে রোগীর কপালে হাত রাখলুম....কপাল থেকে হাত বুলিয়ে গাল বয়ে হাত নিয়ে এলুম তাঁর নাকের পাশে—হাত ভিজে মনে হলো....দেখি, হাতে রক্ত। রোগী পড়ে আছেন আচ্ছন্নের মতো....রোগীর ছেলেমেয়ে ছিলেন পাশে। রোগীর মেয়েকে প্রশ্ন করলুম—আপনাদের আত্মীয় বন্ধু বা পরিচিত কোনো ব্যক্তি আত্মহত্যা করেছিলেন কখনো। ছেলেমেয়ে দুজনে উত্তর দিলেন—না। করলেও তাঁরা জানেন না। আমি প্রশ্ন করলুম—কপালে বা রগে বন্দুকের গুলি লেগে কেউ মারা গেছেন? তাঁরা বললেন—না। তাঁরা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন—একথা জিজ্ঞাসা করবার অর্থ? আমি বললুম—এখনি বলবো।

তার পর রোগীর মাথার পিছন দিকে হাত রাখলুম...হাত রেখে মনে মনে প্রশ্ন করলুম রোগীর দিকে চেয়ে—আমি জেনেছি....বলো, সব কথা বলো। সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখের সামনে ছায়ারূপে উদয় হলো তিনজন পুরুষ—তাদের মধ্যে দুজন ধরে আছে, তৃতীয় জনকে এবং দুপক্ষে চলেছে মারামারি। তার পর দুজনের মধ্যে একজন দেখি, তৃতীয় ব্যক্তির পিছন থেকে তাকে গুলি করলো....সে গুলি লাগলো তৃতীয় ব্যক্তির মাথার খুলির পিছন দিকে....রক্ত বইলো....সঙ্গে সঙ্গে ছায়ামূর্তিগুলি গেল মিলিয়ে।

আমি তখন রোগীকে উদ্দেশ করে বললুম—তোমরা তো জড়দেহে

এ-পৃথিবীতে এখন নেই…তোমার বিদেহী আত্মা বিচরণ করতে করতে এই মহিলার দেহে ভর করেছে….সেজন্য এই দীর্ঘকাল ধরে এঁর এই ব্যাধি··যাতনার শেষ নেই….তোমারও আরাম নেই—অতএব এখানে থেকে কষ্ট ভোগ করো কেন? তোমার স্থান এখন spirit-world-এ ….সেখানে যাও··আরাম পাবে….লক্ষ্যহীনভাবে থাকতে হবে না…. যাতনার বিরাম হবে তোমার। নিরীহ এই মহিলাকে কেন অকারণে যাতনা দাও? ইনি তোমার কোনো অনিষ্ট করেননি।

এর পর মহিলাকে 'পাশ' দিলুম….তিনি চোখ বুজলেন ·তার পর নিদ্রা এবং এ নিদ্রার পর আবার জেগে ওঠার পর কোনো উপসর্গ নেই। তাঁর দেড় বছরের পক্ষাঘাত রোগ সেরে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ সবল হলেন।

এ সংবাদ টাসকোমার খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল এবং সে সংবাদ পড়ে অনেকে কৌতূহলী হয়ে রোগীর গৃহে এসে তাঁকে দেখে যান এবং সকলের কাছে আরোগ্য লাভের প্রণালী ও বিবরণ শুনে বিস্ময় প্রকাশ করেন।

তৃতীয় কেস ··লেখক বলছেন—ক' সপ্তাহ আগের ঘটনা।

এক ভদ্রলোক এসে বললেন, তাঁর কন্যা হঠাৎ পড়ে যান…পড়ে অজ্ঞান হন। বহু চেষ্টায় বহুক্ষণ পরে জ্ঞান হলো… কিন্তু জ্ঞান হবার পর থেকে তাঁর মুখে পরলোকগত আত্মীয়বন্ধুদের নাম…যেন তাদের দেখে তাঁদের সঙ্গেই শুধু কথা কইছেন। ভদ্রলোক বললেন—দু ঘণ্টা হলো, শান্ত হয়েছেন….সহজ মানুষের মতো কথাবার্তা….সহজ স্বাভাবিক ভাব! মৃতদের নাম করা বা তাদের সঙ্গে কথা কওয়া নেই আর। ও-প্রসঙ্গ তুললে কন্যা বললেন আশ্চর্য্য হয়ে—তিনি ওসবের কিছু জানেন না।

লেখক লিখেছেন—ও রকম ভাব (spells) হলে আমাকে খবর দেবেন....তখনি আমি গিয়ে দেখবো।

দুদিন পরে মেয়েটির spell এবং আমার ডাক পড়লো। আমি গেলুম। মেয়েটি ছ ঘণ্টা অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন....কিছুতে জ্ঞান হচ্ছে না। আমি গিয়ে ডাকডাক করবামাত্র ফল পেলুম....স্পিরিটের আবেশ এবং স্পিরিট আমাকে বললে, তার দুজন শত্রু ছিল....তারা একদিন তাকে (স্পিরিটকে তার জীবন্ত অবস্থায়) ধরে তার মাথার পিছন দিকে গুলি করে মারে....সেই থেকে সে স্পিরিট হয়ে আছে।

ডাক্তার লিখেছেন—আমি আশ্চর্য্য হলুম, এ স্পিরিট সেই পক্ষাঘাত ব্যাধিগ্রস্তা। মহিলার দেহে ভর করেছিল প্রায় দু বছর আগে.... আমি তাকে বোঝালুম—এখানেও আরাম পাচ্ছো না তো....তুমি spirit লোকের জীব (আত্মা)... কেন spirit world-এ যাও না। পৃথিবীতে ঘুরলে যাতনার বিরাম হবে না....শুধু যাতনা আর যার উপরে ভর করবে, তাকে ছাড়াবার জন্য তোমার উপর বার বার চলবে জুলুম। বললুম—Turn your attention to the future....make out of your present condition all the happiness you can for yourself and others.

একথার পর রোগীর চেতনা হলো....রোগী কিছু খেতে চাইলেন.... তার পর রোগী ঘুমোলেন—ঘুম পাচ্ছে। আমি 'পাশ' দিলুম....বললুম— ঘুমোন। আর কোনো কষ্ট পাবেন না ...কখনো না।

এবং তার পর রোগীর আর কোনো উপসর্গ ঘটেনি....তিনি সুস্থ সহজ মানুষ হয়ে উঠলেন।

কুড়ি

বেহ্মদত্যির ঘর

Hindu Spiritual Magazine পত্রিকায় ১৯১৩ সালের নভেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত কাহিনীর মর্ম্ম :—

কাহিনীটির লেখক মৈমনসিং-নিবাসী এক প্রতিষ্ঠাপন্ন উকিল···· উকিল রঙপুরে প্রাকটিশ করতেন। মৈমনসিংয়ে এক ব্রাহ্মণ-পরিবারকে সেখানে সকলে বলেন, বেহ্মদত্যির ঘর····বেহ্মদত্যির ঘরের লোক— The family is known as the Brahmadoitya-family. লেখক এ-ঘটনার বিবরণ লিখেছেন····ঘটনার পাত্রপাত্রীদের নামধাম গোপন করে।

তিনি লিখেছেন—মৈমনসিং সহরের প্রান্তে এক ব্রাহ্মণের বাস···· তিনি ছিলেন খুব নিষ্ঠাবান, দেবদ্বিজে ভক্তিমান এবং তান্ত্রিক। বাড়ীতে থাকতেন তিনি, তাঁর স্ত্রী এবং তাঁর দুই পুত্র। বড় ছেলের বয়স তখন চৌদ্দ বছর।

ব্রাহ্মণকে সকলে ভক্তিশ্রদ্ধা করেন····ব্রাহ্মণ পূজার্চ্চনায় খুব নিষ্ঠাবান এবং আশপাশের গ্রামেও কারো বাড়ীতে শান্তি-স্বস্ত্যয়নের প্রয়োজন হলে ব্রাহ্মণের ডাক পড়ে। ব্রাহ্মণের স্বস্ত্যয়নের জোরে····সকলে বলেন, মঙ্গল ছাড়া কখনো অমঙ্গল হয় না। যেখানে গণনায় ব্রাহ্মণ বোঝেন, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন হবে নিষ্ফল····সেখানে কাজ করেন না।

একদিন সকালে ব্রাহ্মণ পত্র পেলেন····তাঁর শ্বশুর বাড়ীর গ্রাম থেকে

এক ভদ্রলোকের পত্র এলো তাকে—সে-গ্রামে তাঁর গৃহে তাঁর পিতার শ্রাদ্ধ....ব্রাহ্মণকে তাই পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ...সে-অনুষ্ঠানে তাঁকে থাকতে হবে....জলপানাদি করবেন এবং অধ্যাপক বিদায়ে প্রাপ্তিযোগ আছে।

পত্র পেয়ে ব্রাহ্মণ খুশী হলেন—ব্রাহ্মণ-ভোজনের দক্ষিণা, সেই সঙ্গে অধ্যাপক বিদায়ে বস্ত্র এবং তৈজসাদি-প্রাপ্তি। তিনি প্রস্তুত হলেন ...সেখানে শ্রাদ্ধ হবে দুদিন পরে। হাঁটা পথে যাওয়া....একটি দিনের পথ। নৌকায় বা পালকিতে করে যাবেন, ব্রাহ্মণের অর্থ তেমন নেই। তিনি স্থির করলেন, পরের দিন সোমবার....সেইদিন প্রত্যুষে যাত্রা করবেন। মাঝ পথে কোনো গ্রামে পুকুরে স্নানাদি করে দোকান থেকে ফল ও সামান্য কিছু মিষ্টান্ন কিনে আবার যাত্রা এবং সন্ধ্যা নাগাদ পৌঁছুবেন নিজের শ্বশুরালয়ে। সেখানে রাত্রে নিদ্রা এবং পরের দিন স্নানাদি সেরে শ্রাদ্ধ-বাড়ীতে উপস্থিত হবেন।

তখন শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি—আকাশে কখনো বৃষ্টি হচ্ছে....মেঘ বৃষ্টি না থাকলে রৌদ্রের প্রচণ্ড তেজ! ব্রাহ্মণ বেরুলেন ঊষাকালে.... পরণে থানধুতি, গায়ে উড়ানি, পায়ে চটিজুতা এবং হাতে গামছা-বাধা গরদের ধুতি-চাদর, নামাবলী এবং সামান্য কিছু পয়সাকড়ি এবং একটি ছাতা।

দুর্গার নাম করে ব্রাহ্মণ বাড়ী থেকে বেরুলেন। তার পর চলেছেন, চলেছেন....মাথার উপর সূর্য্য....সূর্য্যের তেজ প্রখর হচ্ছে, প্রখরতর হচ্ছে। গ্রামের ভিতর দিয়ে পথ....সে-পথ ছেড়ে বামে প্রান্তর-পথ, বনপথ....ব্রাহ্মণ চলেছেন, চলেছেন। দুপুর বেলায় তিনি পেলেন একটা গ্রামে পুকুর....পুকুরে স্নানাদি সেরে সন্ধ্যাবন্দনাদি

সারলেন....তার পর একটা দোকান থেকে কিছু মিষ্টান্ন খেয়ে আবার যাত্রা। যখন আবার বেরুলেন, তখন পশ্চিম আকাশ কালো করে নিবিড় মেঘের সঞ্চার....সামনে একটা জঙ্গল....এই জঙ্গল পার হলেই তাঁর শ্বশুরবাড়ীর গ্রাম। ব্রাহ্মণ বেশ জোর পায়ে চলতে লাগলেন—কিন্তু বনের মাঝামাঝি গাছপালা দুলিয়ে আকাশ কাঁপিয়ে এলো প্রচণ্ড ঝড়....সেই সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি নামলো।

ঝড়ে বড় বড় গাছের ডালপালা ভেঙ্গে পড়ছে....প্রাণের আশঙ্কা প্রতি পদে....তার উপর মুষলধারে বৃষ্টি। নাকালের একশেষ। আশ্রয় নেই কোথাও....কোনোদিকে। ব্রাহ্মণ সেই ঝড় জল ভেদ করে চলেছেন। কিন্তু ক্লান্ত শরীর....তার উপর এত পথ হেঁটে আসা....মধ্যপথে সামান্য একটু মিষ্টান্ন মাত্র খেয়েছেন। ব্রাহ্মণের শ্রান্তির সীমা নেই. শেষে পা হলো ব্যথাতুর, দেহ অবশ, পা চলতে চায় না....শরীরে শক্তি নেই। ব্রাহ্মণের মাথা ঘুরতে লাগলো....ব্রাহ্মণ একটা গাছতলায় শুয়ে পড়লেন....মাথার উপর দিয়ে চললো ঝড়জলের মত্ত মাতন।

তার পর ব্রাহ্মণ একেবারে ঘুমে অচেতন। স্বপ্ন দেখলেন, যেন তিনি মারা গেছেন....তাঁকে চিতায় তোলা হয়েছে....চিতায় আগুন দেওয়া হচ্ছে....পায়ে তিনি পেলেন আগুনের স্পর্শ। ঘুম ভেঙ্গে গেল....ঘুম ভাঙতে চেয়ে দেখেন, ঝড় জল নেই....রাত্রির পরে দিনের উদয় এবং সূর্য্যের প্রখর তাপ তাঁর দেহে পড়েছে। কোনোমতে ব্রাহ্মণ উঠলেন....উঠে গ্রামের দিকে চলেছেন। মাথা দপদপ করছে....বুঝলেন, জ্বর হয়েছে। কিন্তু উপায় নেই....শরীরে শক্তি নেই....তবু টলতে টলতে তিনি চলেছেন। চলতে চলতে ভাবলেন, কখন বুঝি আবার

অচেতন হয়ে পড়ে যাবেন।

এমন সময় দুজন পথিকের সঙ্গে দেখা....তাঁরাও চলেছেন ঐ গ্রামে। তাঁরা ব্রাহ্মণকে দেখে তাঁর অবস্থা বুঝলেন—ব্রাহ্মণ দিলেন পরিচয়। পথিকরা চিনতেন ব্রাহ্মণের শ্বশুরকে....তাঁরা বহু যত্নে ব্রাহ্মণকে এনে পৌঁছে দিলেন ব্রাহ্মণের শ্বশুরালয়ে।

সেখানে পৌঁছেই তিনি শয্যা নিলেন—প্রবল জ্বর, ভুল বকচেন—তাঁরা হলেন আশঙ্কিত...কবিরাজ ডাকালেন। কবিরাজ ব্রাহ্মণকে দেখে বললেন—ভীষণ সান্নিপাতিক জ্বর।

কবিরাজ আশা দিলেন না....কিন্তু বড়ি, পাঁচন দিলেন। ব্রাহ্মণের বাড়ীতে খবর দেওয়া হলো না....কে খবর দেবে? অত দূরে যাওয়া সহজ কথা নয়...কে যাবে, এমন লোকের অভাব....তার উপর পয়সা খরচ! সেখানে কবিরাজ এলেন দুবার তিনবার....কোনোবার আশা দেন না....বলেন—আজ রাত্রিও বুঝি কাটবে না।

এবং তাই হলো—রাত্রি বারোটার পর ব্রাহ্মণ ইহলোক ত্যাগ করে গেলেন। সেখানকার লোকজন ডাকিয়ে শ্বশুর করলেন সৎকারের ব্যবস্থা। এমন বিপদের খবর ব্রাহ্মণের গৃহে নিজ-কন্যাকে কোন্ প্রাণে জানাবেন ভেবে শ্বশুর আকুল....তবু এ খবর দেওয়া চাই। গ্রামের একজন ভদ্রলোক বললেন—আমি যাবো....এ খবর দিতেই হবে! ব্রাহ্মণের মৃত্যু....ছেলেরা আছে....অশৌচ এবং নানা কৃত্য করতে হবে তাদের।

এখন যে রাত্রে ব্রাহ্মণ মারা গেলেন, সে রাত্রে ওদিকে ব্রাহ্মণের গৃহে ব্রাহ্মণের দুই পুত্র ঘুমোচ্ছেন....ব্রাহ্মণীর কিন্তু কিছুতে ঘুম হচ্ছে

না। লোকমুখে তিনি শুনেছেন, পথে খুব ঝড়বৃষ্টি হয়ে গেছে....সে ঝড়বৃষ্টিতে স্বামীর কি অবস্থা হলো, তাঁর মনে দুশ্চিন্তা। কাছেই পুলিশ ফাঁড়ি.. ফাঁড়ির ঘড়িতে বাজলো একটা। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বাড়ীর সদরে কে ডাকলো তাঁর বড় ছেলের নাম ধরে।

ব্রাহ্মণী চমকে উঠলেন। কণ্ঠ তাঁর স্বামীর না? তিনি কাঠ! তার পর আবার ডাক....বড় ছেলের নাম ধরে। ব্রাহ্মণী বুঝলেন, স্বামীর কণ্ঠই...ভুল নেই। তিনি বিছানায় উঠে বসলেন...তার পর আবার ডাক।

বার বার তিনবার। তিনি ভাবলেন, জবাব দেবেন? ছেলেকে ডেকে দেবেন? কিন্তু ভয় হ'লো। পল্লীগ্রামের সংস্কার—গভীর রাত্রে নিশি ডাকে....তিনবার ডাকে....সে ডাকে সাড়া দিলে মৃত্যু। ব্রাহ্মণী ভাবলেন, যদি নিশির ডাক হয়।

আবার ডাক বড় ছেলের নাম ধরে—স্বামীর কণ্ঠ! তিনি তখন বড় ছেলেকে ঘুম থেকে তুললেন....বললেন—ছাখ্ তো সদর খুলে বাহিরে গিয়ে....উনি এলেন কি না। চার বার ডেকেছেন তোর নাম ধরে।

বড় ছেলে উঠে সদরে গেল....কিন্তু কোথায় কে! জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই....নিঝুম নিস্তব্ধ রাত্রি....শুধু দূরে দু-চারটে কুকুর ডাকছে।

ছেলে ফিরে এসে মাকে বললে—কেউ না, মা।

ছেলে বিছানায় শুয়ে ঘুমোলে....ব্রাহ্মণীর রাত্রি যে করে কাটলো, বলবার নয়।

পরের দিন বেলা দশটা....লোক এসে খবর দিলে—গতকাল রাত্রি

একটা নাগাদ ব্রাহ্মণের মৃত্যু হয়েছে....ব্রাহ্মণীর পিত্রালয়ে। তাঁর দেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সৎকারের জন্য। ছেলের কাজ মুখাগ্নি করা....কিন্তু এক্ষেত্রে ছেলের জন্য সে কাজ বন্ধ রাখলে পাপ হবে, অকল্যাণ হবে....তাই ব্রাহ্মণ পুরোহিত দিয়ে মুখাগ্নির ব্যবস্থা হয়েছে।

ব্যাপার কিন্তু এইখানে শেষ হলো না।

রাত্রে ছেলে শুনলো পিতার কণ্ঠ....পিতা বললেন—আমার মৃত্যুর পরে আমার দেহ ঘর থেকে বাহিরের উঠানে বার করা হয়েছিল এবং মৃত্যুর পরেও বৈদ্য কবিরাজ আমার নাড়ী পরীক্ষা করেছিল....সেজন্য অশুচি হয়েছে। ভালো করে শ্রাদ্ধ হয় যেন এবং শ্রাদ্ধের পরে গয়ায় গিয়ে পিণ্ড দিয়ে এসো....নাহলে আমার মুক্তি হবে না ...ব্রহ্মদৈত্য হয়ে থাকতে হবে।

শ্রাদ্ধাদি হলো....কিন্তু গয়ায় গিয়ে পিণ্ড দেওয়া হলো না। গয়ায় যেতে কত খরচ—মৈমনসিং থেকে কলকাতা যাওয়া....তার পর কলকাতা থেকে গয়ায় যাওয়া-আসা...সেখানে খরচ পত্র। তার উপর ছেলের বয়স চোদ্দ বছর....একা তাকে সুদূর বিদেশ গয়ায় পাঠানো....মায়ের ভয় করে। ব্রাহ্মণী বললেন—শ্রাদ্ধ শুদ্ধাচারে হয়েছে....কেন মুক্তি হবে না?

কিন্তু এর পর শুধু বড় ছেলে নয়....ব্রাহ্মণীও শোনেন অদৃশ্য স্বামীর কণ্ঠস্বর, গয়া....গয়া....গয়া! স্ত্রী নিরুপায়....গয়ার কোনো ব্যবস্থা তিনি করতে পারেন না।

অবশেষে বাড়ীর সামনে যে বড় অশথ গাছ....সেই গাছে গ্রামের লোক দেখতে লাগলো, সন্ধ্যার পর থেকে এক ব্রাহ্মণ বসে আছেন।

সকলকে ডেকে ব্রাহ্মণ বলেন—কুলাঙ্গার। আমার দুর্গতি ভোগ দেখেও গয়ায় যায় না।

একদিন বাড়ীতে এলেন ব্রাহ্মণীর এক ভগ্নী তাঁর পুত্রকন্যাদের নিয়ে....ভগ্নী এলেন ব্রাহ্মণীর শোকে সান্ত্বনা দিতে। যেদিন তাঁরা এলেন, সেই দিন রাত্রে ভগ্নীর কন্যা....তেরো বছর বয়স, বিবাহিতা.... খেতে বসে হঠাৎ হা-হা অট্টহাস্য করে উঠলো। তার পর ভাতের থালা ছুড়ে দেয়...দিয়ে হাত-পা ছোড়া এবং কান্না।

সারা রাত তার এই উপসর্গ। পরের দিন পাড়ার লোকজন তাকে দেখলেন, তার কথা শুনলেন...তাঁরা বললেন—আশ্চর্য্য নয়, মেয়েকে ভূতে পেয়েছে....রোজা ডাকো।

রোজা আনা হলো। রোজা বাড়ীতে দেখবামাত্র ব্রাহ্মণীর ভগ্নীর কন্যার বিষম চীৎকার, গালাগালি। তার পর রোজার মন্ত্রতন্ত্রাদি চললো, ...তখন কন্যার মুখে জানা গেল—ছেলে এবং ব্রাহ্মণী কিছুতে কথা শোনেন না....গয়ায় যান না...মুক্তি নেই....ব্রহ্মদৈত্য হয়ে পড়ে থাকা.. সেজন্য এবার উৎপাত সুরু করলেন। বললেন—গয়ায় যাক বড় ছেলে ....পিণ্ড দিক....নাহলে বিপদ হবে।

প্রশ্ন হলো—ছোট ছেলে.. একা কি করে যাবে?

জবাব: আমি বরাবর থাকবো সঙ্গে। কোনো ভয় নেই। বিশ্বাস করতে বলো।

প্রশ্ন: টাকা?

জবাব: আমার শোবার ঘরের পশ্চিম কোণে খুঁড়লে পাবে ভাঁড় ....সেই ভাঁড়ে আমার কিছু সঞ্চয় প্রায় পঞ্চাশ টাকা আছে।

নির্দ্দেশ হলো···তারিখ নির্দ্ধারণ করে নির্দ্দেশ হলো—অমুক তারিখে যাত্রা করুক···আমি থাকবো সঙ্গে···নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।

অগত্যা বড়ছেলে একলা চললো গয়ায়—মৈমনসিং থেকে গোয়ালন্দ···গোয়ালন্দ থেকে কলকাতা···তার পর কলকাতা থেকে গয়া।

গয়ায় পৌঁছে পাণ্ডা মিললো··· পাণ্ডার সঙ্গে যেতে যেতে পথে একটা বড় পাথরে ছেলে বসলো। পাণ্ডা বললেন—আমি এখনি ব্যবস্থা করে আসছি····এসে নিয়ে যাবো।

বড়ছেলে পাথরে বসে আছে· হঠাৎ শুনলো পিতার কণ্ঠস্বর। ছেলে চমকে উঠলো।

কণ্ঠ শুনলো—ভয় নেই। আমি সঙ্গে সঙ্গে আছি বরাবর। পিণ্ড দাও····পুত্রের কাজ করো··· আমাকে মুক্তি দাও···মঙ্গল হবে।

ছেলে বললে—পিণ্ড দেবার পর তোমার কথা আর শুনবো না?

জবাব: না।

ছেলে বললে—তুমি মুক্তি পেয়ে চলে গেলে····কি করে জানবো?

জবাব: যে বড় পাথরে বসে আছো····পিণ্ডদানের পর এখানে এলে দেখবে, পাথরখানা দু টুকরো হয়েছে।

—আর কোনো প্রমাণ?

জবাব: বাড়ী ফেরার সঙ্গে পাবে তোমার নামে মনিঅর্ডারে আসবে একশো টাকা। বহুকাল পূর্ব্বে একজনের গৃহে স্বস্ত্যয়ন করেছিলুম তার কারবারের মঙ্গলের জন্য····তার মঙ্গল হয়েছে····সে এ টাকা পাঠাবে তোমার নামে। আমি মারা গেছি সে জানে—সে এ টাকা পাঠাবে····

আমি আজই তার ব্যবস্থা করবো যাবার আগে।

তার পর যথারীতি পিণ্ডদান হলো এবং আশ্চর্য্য....ছেলে এসে দেখে, অত বড় পাথর দুখানা হয়ে পড়ে আছে এবং গয়ায় কাজ সেরে মৈমনসিং ফেরা—যেদিন বাড়ী ফেরা, তার পরের দিন মনিঅর্ডার এলো তার নামে....ঢাকা থেকে এক ভদ্রলোক পাঠিয়েছেন তাকে একশো টাকা।

তার পর ছেলে দুটির মঙ্গলই হয়েছে এবং এ-পরিবারকে ওখানকার লোক বলে, বেহ্মদত্যির ঘর।

একুশ

ভূত ঠ্যাঙ্গানো

এ-কাহিনীটি প্রকাশিত হয়েছিল Hindu Spiritual Magazine পত্রিকায় ১৯১২ সালের অক্টোবর সংখ্যায়। লেখক বী, ব্যানার্জী এক এম-বী ডাক্তার।

তিনি যা লিখেছেন, সঙ্কলিত করে দিচ্ছি :—

তিনি লিখেছেন—পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। কলকাতার কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের উপর দোতলা মেশ…আমি থাকি সেই মেশের দোতলায়। একদিন দুপুর বেলা… বেলা তখন দুটো…ভাড়াটে গাড়ী করে এক ভদ্রলোক এলেন আমার ঘরে….তাঁর সঙ্গে একটা পোর্টম্যান্টো। তিনি এসে পরিচয় দিলেন….বুঝলুম, আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু তিনি। (চেহারা এমন রুগ্ন যে আমি তাঁকে দেখে চিনতে পারিনি)।

বন্ধু বললেন—তিনি বহুদিন যাবৎ রোগে ভুগচেন…চিকিৎসার সুবিধার জন্য কলকাতায় আমার কাছে এসেছেন।

মুখহাত ধুলেন….জলখাবার আনিয়ে দিলুম….খেলেন….খেয়ে একটু আরাম পেয়ে বন্ধু বললেন, তিনি পুলিশে চাকরি করছিলেন। (বন্ধুকে ক বলে অভিহিত করবো) ক বললেন—ক বছর আগে র-গ্রামে ভীষণ ডাকাতি হয়….ডাকাতরা দলে ছিল পঁচিশ-ত্রিশ জন… আর দলের লোক বেশীর ভাগ সাঁওতাল। স্থানীয় পুলিশ….একজন সাব-ইন্‌স্‌পেক্টর করলো ডাকাতির তদন্ত….কিন্তু কোনো সন্ধান মিললো না। তার পর ক অভিজ্ঞ

ইন্‌স্‌পেক্টর....তাঁর উপর তদারক-তদন্তের ভার পড়লো। ডাকাতি ধরার কাজে ক-র সুনাম....তদারকীর ব্যাপারে তিনি এলেন দূরের এক গ্রামে।

পাহাড়ী মহল্লায় তাঁর বাসা....দোতলা মাটকোঠা....তিনি সেখানে একা থাকেন....তাঁর বাড়ীর কাছে বস্তী....সে-বস্তীতে থাকে কজন গেঁয়ো মানুষ সপরিবারে। কাঠ কাটা, বন থেকে মধু সংগ্রহ.... তাদের কাজ। ক এলেন এখানে....সঙ্গে তাঁর এক পুরাতন ভৃত্য এবং এক পাচক....ক আস্তানা নিলেন দোতলায়....ভৃত্য এবং পাচক থাকে একতলায়। ক-র সঙ্গে এসেছিল তাঁর এক পাকা জমাদার.... তার পর যেখানে এলেন, সেখানকার থানার দুজন চৌকিদারকে তিনি নিলেন সন্ধানের কাজে।

প্রত্যহ সকালে ক বেরোন এখানকার দুজন চৌকিদার এবং তাঁর জমাদারকে নিয়ে এবং আশেপাশে এবং ভিতর দিককার নানা গ্রামে সন্ধান করে বেড়ান ডাকাতদের।

একদিন সন্ধ্যার সময় রোঁদ দিতে বেরিয়ে ক দেখেন, এক জায়গায় একদল সাঁওতালের জটলা....তারা চেঁচাচ্ছে....নানা রকম অঙ্গভঙ্গী করছে। এ-জায়গার চালাঘরগুলো অন্য ছাঁদের—দুখানা করে ঘর.... ঘরের পিছনে একটুখানি করে খোলা জায়গা....তার পর বাঁশের বেড়া— জায়গা এবং ঘরগুলি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ক ভাবলেন, এখানে নিশ্চয় সন্ধান মিলবে। তিনি এসে হাজির হলেন তাদের সামনে....সঙ্গে চৌকিদার দেখে সাঁওতালরা করলো সেলাম। ক প্রশ্ন করলেন—এখানে কিসের জটলা?

দলের মধ্যে সবার চেয়ে বয়সে বড় এক সাঁওতাল সেলাম

করে জানালো—এই ঘরে যারা থাকে, তাদের কিশোর বয়সের এক সুন্দরী কন্যাকে আজ চার-পাঁচদিন হলো ভূতে পেয়েছে....তাই দূরগাঁয়ের খুব নামজাদা রোজা আনা হয়েছে। সে-রোজা বাড়ীর মধ্যে গেছে....ভূত ছাড়াচ্ছে। ক-র একথা বিশ্বাস হলো। পুলিশের সন্দিগ্ধ মন, তিনি ঠিক করে নিলেন, রোজা....ভূতে পাওয়া এ-সব বাজে কথা ....নিশ্চয় ডাকাতের দল....ফন্দী আঁটছে এবং যাকে রোজা বলছে, সে নিশ্চয় দলের সর্দার।

পুলিশের লোক....একথা যেমন মনে হওয়া, সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মক্ষেত্রে নামা। তিনি দিলেন সেই সর্দারকে হুকুম—যাও, এখনি রোজাকে এখানে আসতে বলো।

এ-আদেশ শিরোধার্য্য করে সর্দার গেল ভিতরে এবং অবিলম্বে ফিরলো এক অতিবৃদ্ধ ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে। অতিবৃদ্ধের বয়স হবে আশি-নব্বই বছর....লোল-চর্ম্ম....চোখে দড়ি বাঁধা ফ্রেমে চশমা...শীর্ণ দেহ....পিঠ বেঁকে গেছে....মাথায় পাকা চুল....মুখে পাকা গোঁফদাড়ি।

রোজা এসে সেলাম করে সামনে দাঁড়ালো....জড়ো সড়ো মূর্ত্তি। ক তখন তাকে বেশ রুদ্র রবে তাচ্ছল্যের ভঙ্গীতে নানা প্রশ্ন করতে লাগলেন। তাকে দু-চারটে গালাগাল দিতেও ক-র লজ্জা হয়নি। (ক বললেন, পুলিশের মুখ....ভদ্র কথা সহজে যেন কণ্ঠ থেকে বেরুতে চায় না....বিশেষ এমন সন্দেহের ক্ষেত্রে।) বৃদ্ধ রোজা তাঁকে নম্র কণ্ঠে নিষেধ করলেন গালাগাল দিতে....বললেন—দারোগাবাবু যা জানতে চান....বৃদ্ধ যা জানে....সত্য জবাব দেবে। ক বললেন—চালাকির জায়গা পাওনি! বটে! তুমি ভূতের রোজা নও...তুমি ডাকাত

দলের সর্দার।

বৃদ্ধ বললেন—না দারোগাবাবু, ডাকাতির কিছু জানি না, ডাকাতের সঙ্গে জানাশুনাও নেই আমার। আমি সামান্য মানুষ....ভূতের রোজাগিরি করি আর চাষবাস আছে কিছু।

ক তুললেন হুঙ্কার—রাবিশ! ভূত আবার আছে না কি....না, ভূতে পায় মানুষকে! ভূত-টুত আমি মানি না।

বৃদ্ধ বললেন—দারোগাবাবুর বিশ্বাস হবে....ভূত যদি দেখাতে পারি?

ক বললেন—পারো দেখাতে?

—পারি হুজুর।

—দেখাও! না যদি পারো, গ্রেফতার করে নিয়ে যাবো।

বৃদ্ধ বললেন, তাই নিয়ে যাবেন হুজুর। কিন্তু এখন দেখাতে পারবো না....রাত্রে যদি হুকুম দেন, দেখাবো।

সেদিন পূর্ণিমা তিথি...বললেন—বেশ, আজ রাত্রে দেখতে চাই।

বৃদ্ধ বললেন—আপনার বাসায় যাবো সন্ধ্যার পর হুজুর....তার পর আপনাকে নিয়ে যাবো ভূত দেখাতে।

এ-কথা পাকা রইলো। ক দিলেন তাঁর জমাদার এবং এখানকার দুই চৌকিদারকে নির্দ্দেশ—বুড়োর উপর কড়া নজর রাখবে....কোথায় যায়, কি করে!

তার পর রাত দশটা....ক খাওয়া দাওয়া সারলেন....সেরে ইউনিফর্ম্ম আঁটলেন....সঙ্গে নিলেন ছ-চেম্বার রিভলভার, কতকগুলো কার্টরিজ, লোহার বাঁধানো মোটা একটা লাঠি! জমাদার এবং চৌকিদারদের বললেন—আমি বেরুচ্ছি ঐ বুড়োর সঙ্গে....ওরা না

জানতে পারে, তোমরা নজর রাখবে....বিউগলভারের আওয়াজ শুনলে তখনি ছুটে যাবে....বুঝবে, আমার বিপদ!

এ-কথা বলে তিনি বেরুলেন বৃদ্ধের সঙ্গে। পূর্ণিমার জ্যোৎস্না.... চারিদিকে চমৎকার দৃশ্য....ছোট ছোট পাহাড়, ছোট ছোট নদী, বনভূমি, সমতল ভূমি। ক চলেছেন বৃদ্ধ রোজার সঙ্গে!

এক জায়গায় আসবামাত্র ক পেলেন টাটকা গোলাপ ফুলের গন্ধ.... ভাবলেন, বনে কোনোখানে গোলাপের ঝাড়ে গোলাপ ফুটেছে।

দুজনে চলেছেন...চলেছেন....যত এগিয়ে চলেন, গোলাপের গন্ধ আরো নিবিড় হয়....অথচ জ্যোৎস্নায় চারিদিকে চেয়ে গোলাপের একটা চারাও দেখেন না। বুড়ো রোজাকে তখন প্রশ্ন করলেন—আরো কত দূরে যাবে?

বুড়ো বললেন—এসে পড়েছি হুজুর।

আরো দু মাইল চলে এলেন। গোলাপের গন্ধ এত নিবিড়....ক গাইয়ে মানুষ....তিনি মৃদুকণ্ঠে গান ধরে দিলেন—গান গাইতে গাইতে চলেছেন।

এবারে পথ পাহাড়ের বাঁক ঘুরে—পাহাড়ের বুকে একটা মহুয়া গাছ ....শাখা-প্রশাখা বেশ প্রসারিত। পাহাড়টা প্রায় দুশো ফুট উঁচু। পাহাড় বয়ে এবারে উঁচুতে ওঠা....পাহাড়ে উঠতে গোলাপের গন্ধ আরো নিবিড় হলো....এত তীব্র গন্ধ যে সহ্য হয় না যেন।

কেমন যেন নেশার মতো! তিনি গান গাইতে গাইতে পাহাড়-পথে উঠছেন। খেয়েই বেরিয়েছেন.... এমন দীর্ঘ পথ হাঁটা....পিপাসায় তার কণ্ঠ হলো শুষ্ক। তিনি প্রশ্ন করলেন রোজাকে—একটু জল খাওয়াতে পারো?

রোজা বললেন—ঝর্ণার জল পড়ে ঝিরঝির করে জল বইছে.... নদীর ফালির মতো আছে একটা....সেটা পাহাড়ের ওদিকে, হুজুর। পাহাড়ের মাথা থেকে ঢালু পথ নেমে গেছে সেই নদীর গা পর্য্যন্ত.... সেখান দিয়ে যেতে কষ্ট হবে না হুজুর....জল খেতে পারবেন।

পাহাড়ের মাথায় উঠে সেই পথ ধরে ওদিকে নামা। বড় বড় কটা পাথরের স্তূপ....সেই সব স্তূপের মাঝে মাঝে জলের শীর্ণ রেখা বয়ে

চলেছে বালির গা চিরে—লম্বে প্রায় বিশ-পঁচিশ ফুট, চওড়ায় এক গজ মাত্র, গভীর হবে আট-দশ ইঞ্চি। পাহাড়ের বুক থেকে জল দেখে ক বেশ স্বস্তি বোধ করলেন।

পাহাড় থেকে নেমে রোজা বললেন—হুজুর, ব্রাহ্মণ মানুষ....আমার ছোঁয়া জল তো খাবেন না....আমি খুব নীচু জাত। কাজেই হুজুরকে কষ্ট করে নিজে গিয়ে নদীর জল খেতে হবে। সে কাছেই দাঁড়িয়ে থাকবে। এখান থেকে দুশো গজ দূরে হুজুর, ভূত আছে....দেখতে পাবেন....হুজুরের তাহলে ভূতে বিশ্বাস হবে।

ক বললেন—বেশ, তুমি ঐখানে থাকো....আমি গিয়ে জল খেয়ে আসি।

ঘোরা ঢালুপথে ক এলেন নেমে সেই বহমান জলরেখার কাছে, নীচু হয়ে জল নিয়ে মুখ হাত ধুলেন, তার পর একটা পাথরের চাঙড় ঘুরে তিনি এলেন....যেখানে জল একটু গভীর, সেইখানে। এসে অঞ্জলি ভরে পরিষ্কার জল খাবেন....হঠাৎ জলে ছলাৎ ছলাৎ শব্দ! চোখ তুলে চেয়ে দেখেন, কালো একটা সাঁওতাল স্রোতস্বিনীর ওপারে পাঁচ-সাত হাত দূরে....জলে নেমে দু পা নেড়ে জল ঘোলাচ্ছে। পুলিশী মেজাজে তিনি ধমক দিলেন—এইয়ো, খবর্দার!

তার বয়ে গেছে গ্রাহ্য করতে। পুলিশ হুজুরের প্রতি দৃকপাত না করে সে পা দিয়ে জল ঘোলাতে লাগলো।

ক চটলেন! এত বড় আস্পর্দ্ধা কালো সাঁওতালের! তিনি আবার হাঁকলেন—খবর্দার!

তার খবর্দারী করবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। রাগে তখন ক জ্বলে উঠলেন....হাতের লোহা-বাঁধানো ডাণ্ডা বাগিয়ে জলে নেমে তিনি এগুলেন সেই বর্ব্বর সাঁওতালের দিকে। সাঁওতাল ঠিক তেমনি খাড়া আছে। জ্যোৎস্নায় তা'র চেহারা যা দেখলেন, জোয়ান কালো দেহ....মুখখানা যেন দর্পে দম্ভে ভরা....দু চোখে রুক্ষ কঠিন দৃষ্টি!

ক দিলেন তাকে গালাগালি....পুলিশের পুঁজিতে যত কদর্য্য গালি জড়ো আছে, সেগুলির মধ্যে কদর্য্যতম গালি। তাতেও তার ভ্রূক্ষেপ

নেই····তবে গালি খেয়ে তার দাঁতের পাঁতি বেরুলো। তখন অসহ্য বোধে ক মারলেন তাকে ঐ ডাণ্ডার একটি ঘা! কিন্তু আশ্চর্য্য—ডাণ্ডা লাগলো তার গায়ে····মনে হলো, বাতাসে ডাণ্ডা প্রহার····ডাণ্ডার প্রান্তে solid বস্তুর আভাস পেলেন না। তার পর আর এক ঘা····আর এক ঘা—সাঁওতাল তেমনি অটল। তখন ডাণ্ডার খোঁচা দিলেন···· দেখলেন, সাঁওতালের দেহ ভেদ করে ডাণ্ডাটা চলে গেল দেহের এ-ফোঁড় ও-ফোড়। তখন তাঁর ভয় হলো এবং এই ভয়ের মুহূর্ত্তে সাঁওতালের অট্টহাসির রব। ক তখন রিভলভারে তিনটে আওয়াজ করলেন····করেই তিনি অজ্ঞান-অচেতন হয়ে সেইখানে লুটিয়ে পড়লেন।

যখন জ্ঞান হলো····দেখেন, পাথরের একটা ঢিপিতে তিনি শুয়ে আছেন····বুড়ো রোজা, তাঁর জমাদার এবং থানার দুজন চৌকিদার তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করছে।

জমাদার বললে—তারা হুঁশিয়ার ছিল····রিভলভারের আওয়াজ পেয়ে তারা ছুটে এসেছে····এসে দেখে, হুজুর অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন···· আর এই বুড়ো রোজা দিচ্ছে হুজুরের মুখে জল।

খানিক পরে বল পেয়ে ক দিলেন চৌকিদারদের সরিয়ে····তার পর তাঁর কথা হলো রোজার সঙ্গে :—

ক প্রশ্ন করলেন—ও সাঁওতালটা কে?

জবাব : হুজুরই তো বুঝেচেন।

ক বললেন—মানুষ হতে পারে না। ঐ ডাণ্ডার তিন-তিন ঘা খেয়ে খাড়া থাকা····তার পর ডাণ্ডার খোঁচা মারলুম····ডাণ্ডা ওর দেহ ভেদ করলো এফোঁড় ওফোঁড়! মানুষ হলে এমন হতে পারে না····তাহলে ও ভূত···সাঁওতালের মূর্ত্তি ধরে দেখা দিয়েছিল।

রোজা : আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করছেন হুজুর! আপনার নিজের চোখেই যখন দেখেছেন। হুজুর বলেছিলেন ভূত দেখাতে····তাই আমি হুজুরকে এখানে এনেছিলুম। তবে আমি ছিলুম····তাই নিশ্চিন্ত

····প্রাণহানি হবে না।

ক বেশ চিন্তাগ্রস্ত হলেন। তিনি বললেন—যা করেছি, এর জন্য বিপদ হবে না তো!

রোজা বললেন—আপনি অন্যায় করেছেন হুজুর। ওকে অমন ঠ্যাঙানো, গালি দেওয়া····আমি না থাকলে ও আপনাকে প্রাণে মারতো। সে-ভয় নেই····সে-ভয় আমি কাটাতে পারবো····তবে এর জন্য আপনার কিছু দুর্ভোগ ভুগতে হবে হুজুর।

ক বললেন—আমি মারতুম না····ও আমাকে রাগিয়ে দিলে····জল ঘোলা করছিল কেন?

রোজা বললেন, কশুর নেবেন না হুজুর। ও শুধু আপনাকে বোঝাতে চেয়েছিল যে ও ভূত····সাঁওতাল মূর্ত্তিতে দেখা দিতে এসেছে।

ক বললেন—কিন্তু আমি কি করে তা বুঝবো?

রোজা বললেন—এ-তল্লাটে আসবামাত্র গোলাপ ফুলের গন্ধ পেয়েছিলেন? এখানে কোথায় গোলাপ ফোটে যে গোলাপের গন্ধ পাবেন! ওরা যেখানে আসে, সেখানে হঠাৎ হয় খুব ভালো গন্ধ পাওয়া যায়····না হয় খুব দুর্গন্ধ।

ক বললেন—ছেলেবেলায় গল্প শুনেছিলুম বটে! তা যাক, এখন আমার সন্দেহ গেছে। কিন্তু সত্য বলো, এর জন্য আমাকে কি রকম দুর্ভোগ ভোগ করতে হবে।

রোজা বললেন—খুব অসুখ হবে, হুজুর····বেশ ভুগবেন····তবে সেরে উঠবেন, প্রাণে মারা যাবেন না।

এ-কাহিনী শেষ করিয়া ক বললেন ডাক্তার-বন্ধুকে····কলকাতায় এসেছেন, কলকাতার খুব ভালো ডাক্তার দেখিয়ে আরোগ্যলাভের জন্য।

ডাক্তার দেখানো হলো····তার উপর তান্ত্রিক-প্রণালী চললো এবং তান্ত্রিক সিদ্ধান্ত করেন, সেই ভূতের ভর চলেছে সমানে। তখন তান্ত্রিক-মতে ভূত তাড়ানোর ব্যবস্থা। ক আরোগ্যলাভ করলেন।

সমাপ্ত